ইসলামী সংস্কৃতি

আসাদ বিন হাফিজ

ইসলামী সংস্কৃতি

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮

www.icsbook.info

ইসলামী সংস্কৃতি
আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশিকা : কামরুন্নেছা মাকসুদা
প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ মোবাইল: ০১৭১৫২৫৩৩৬
তৃতীয় মুদ্রণ : মে ২০০৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী ২০০১
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৫, প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্যঃ ৮০.০০

Islami Songskrity By Asad bin Hafiz
Published By Kamrunnesa Maksuda
Preeti Prokashon, 435/ka, Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758 Mobil : 0171525336
3rd Edition : May 2006, 2nd Edition : February 2001
1st Edition : January 1995, Cover Design : Preeti Design Center
Printed at : Preeti Computer Service
435/k, Bara Moghbazar, Dhaka-1217

PRICE : Tk. 80.00

ISBN : 984-581-171-x

www.icsbook.info

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

১৯৯৫ সালে ইসলামী সংস্কৃতি বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটিতে ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও চেতনার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার প্রেক্ষাপট নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। ইসলামী সংস্কৃতি অধ্যায়ে ইসলাম কি, জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, সংস্কৃতির সাথে ইসলামের সম্পর্ক কি এসব যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনি মুসলমানদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বাতিলের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভয়াবহ চিত্রও তুলে ধরা হয়। একই সাথে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের এই নাজুক পরিস্থিতিতে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমসমূহ নিয়েও আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের সফলতার নিয়ামক শক্তিরূপে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা তুলে ধরা হয়।

আলহামদুলিল্লাহ। সাধারণ মুসলমানতো বটেই, ইসলামী আন্দোলনের অনেক নেতা-কর্মীও বইটি গুরুত্ব সহকারে পড়েছেন এবং একে সময়োপযোগী একটি জরুরী গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেছেন। অযথা জটিলতা পরিহার করে ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে সহজ সরল ভাষায় একটি স্পষ্ট ধারনা তুলে ধরার ফলেই হয়তো বইটি সহজে সবার দৃষ্টি কেড়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেলেও নানা জটিলতার কারণে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে যেমন বিলম্ব হয় তেমনি তৃতীয় মুদ্রণও অনাকাঙ্খিত বিলম্ব হলো। এ জন্য সত্যি আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি ইসলামী সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী অনেকে ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরে একটি অধ্যায় সংযোজনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁদের সে পরামর্শের আলোকে 'সংযোজন-১' অংশে 'ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্য চর্চা' সংযুক্ত হলো।

অনেক ছাত্র-ছাত্রী জানিয়েছেন বইটির ওপর তারা পাঠচক্র করছেন। তারা বিশেষ করে ইসলামী সংস্কৃতি অংশটুকুর একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরী করে দেয়ার দাবী জানানোর কারণে এ গ্রন্থের 'সংযোজন-২' অংশে তা পূরণের চেষ্টা করা হলো।

বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য, আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য আল্লাহ সবাইকে ইসলামের ওপর অটল থাকার তৌফিক দিন। আমীন।

– লেখক।

www.icsbook.info

লেখকের অন্যান্য বই

গবেষণা .....

আল কোরআনের বিষয় অভিধান • ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস • ইসলামী সংস্কৃতি।

কবিতা–ছড়া–গান .....

অনিবার্য বিপ্লবের ইশতেহার • কি দেখো দাঁড়িয়ে একা সুহাসিনী ভোর • অবশেষে দেশপ্রেমিকরাই জয়ী হয় • নাতিয়াতুন্নবী • হীরালালের ছড়া রাজনীতি ধুমধাম • জ্যোতির পরাগ।

উপন্যাস-গল্প-কিশোরগল্প .....

মহাকালের মহানায়ক • ইয়াগো মিয়াগো • ভিনগ্রহের বন্ধু • জ্বীনের সঙ্গে বসবাস।

জীবনী .....

আপোষহীন এক সংগ্রামী নেতা • নাম তাঁর ফররুখ।

শিশু সাহিত্য .....

আলোর হাসি ফুলের গান • নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন • আলোর পথে এসো • কুক কুরু কু • হরফ নিয়ে ছড়া • আল্লাহ মহান • কারবালা কাহিনী • মজার ছড়া • মজার ছড়া বাংলা পড়া • মজার ছড়া আরবী পড়া • ছন্দে ছড়ায় ভাষার লড়াই • টাট্টু ঘোড়া • দুষ্ট বুড়ি • বাংলা পড়া ৪ • বাংলা পড়া ৫।

ক্রুসেড সিরিজ .....

গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান • সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর কমান্ডো অভিযান • সুবাক দুর্গে আক্রমন • ভয়ংকর ষড়যন্ত্র • ভয়াল রজনী • আবারো সংঘাত • দুর্গ পতন • ফেরাউনের গুপ্তধন • উপকূলে সংঘর্ষ • সর্প কেল্লার খুনী • চারদিকে চক্রান্ত • গোপন বিদ্রোহী • পাপের ফল • তুমুল লড়াই • উমরু দরবেশ • টার্গেট ফিলিস্তিন • গাদ্দার • বিষাক্ত ছোবল • খুনী চক্রের আস্তানায় • পাল্টা ধাওয়া • ধাপ্পাবাজ • হেমসের যোদ্ধা • ইহুদী কন্যা • সামনে বৈরুত • দুর্গম পাহাড় • ভন্ডপীর • ছোট বেগম • রক্তস্রোত • রিচার্ডের নৌবহর • **মহাসমর**।

সম্পাদনা .....

নির্বাচিত হামদ-এ বারিতালা • নির্বাচিত নাতে রাসূল [সা.] • রাসূলের শানে কবিতা • নির্বাচিত ইসলামী গান • নির্বাচিত ইসলামী গান (১-৪ খন্ড) • রাজপথের ছড়া।

হাদীসগ্রন্থ সম্পাদনা .....

যাদেরাহ (পথের সম্বল)-আল্লামা জলীল আহসান নদভী • তাফহীমূল হাদীস-আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

নসীম হিজাযীর উপন্যাস সম্পাদনা .....

সীমান্ত ঈগল • হেজাযের কাফেলা • আঁধার রাতের মুসাফির • শেষ বিকালের কান্না • কায়সার ও কিসরা • ইরান তুরান কাবার পথে • ইউসুফ বিন তাশফীন • কিং সায়মনের রাজত্ব • আলোর কুসুম

অন্যান্যগ্রন্থ সম্পাদনা .....

দি সোর্ড অব টিপু সুলতান–ভগওয়ান এস গিদওয়ানি • কাব্য সমগ্র-গোলাম মোস্তফা • কবিতা সমগ্র–তালিম হোসেন • গল্প সমগ্র–রাজিয়া মজিদ

www.icsbook.info

সূ চী প ত্র

অধ্যায়-১

আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও চেতনার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত (১১-২১)

আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ১১, এ নিদর্শন কাদের? ১২, বাংলাদেশের আদি সংস্কৃতি ১৩, পাল বংশের উৎপত্তি ১৫, সেন আগমনে বিপর্যস্ত সংস্কৃতি ১৬, মুসলিম আগমন : রাহু মুক্তি ১৬, মুসলিম আগমনে সংস্কৃতির নবরূপায়ন ১৮, সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র : সূচনা ও ক্রমবিকাশ ১৭, স্বাধীনতা-উত্তর সংস্কৃতি ২০

অধ্যায়-২ : সংস্কৃতির সংজ্ঞা (২২-৩৩)

বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি ২২, পাশ্চাত্য মনীষীদের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি ২৫, ইউনেস্কো সম্মেলনে স্থিরীকৃত সংস্কৃতির সংজ্ঞা ২৬, বাংলাদেশ জাতীয় সংস্কৃতি কমিশনের মতে সংস্কৃতি ২৬, পারিভাষিক অর্থে সংস্কৃতি ২৭, সংস্কৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণা ২৮, অপসংস্কৃতি ২৮, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা রক্ষার আন্তর্জাতিক নীতিমালা ৩১

অধ্যায়-৩ : তুলনামূলক আলোচনা (৩৪-৩৮)

সংস্কৃতির স্বরূপ ৩৪, সংস্কৃতি ও জীবন দর্শন ৩৪, সংস্কৃতি ও আদর্শগত বিশ্বাস ৩৬, সংস্কৃতি ও ধর্ম ৩৭

অধ্যায়-৪ : ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার প্রেক্ষাপট (৩৯-৪২)

১.রাজনৈতিক পদক্ষেপ ৩৯,২.কূটনৈতিক পদক্ষেপ ৪০,৩.সাংস্কৃতিক পদক্ষেপ ৪২

অধ্যায়-৫ : ইসলামী সংস্কৃতি (৪৩-৬৩)

ইসলাম কি এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় ৪৩, ইসলাম এক কালাতীত জীবন ব্যবস্থা ৪৪, ইসলামের চিরন্তনতা ও কালোত্তীর্ণতার নিয়ামক ৪৪, ইসলাম কি চায় ৪৪, ইজতিহাদ ও অপরিবর্তনীয় বিষয় ৪৫, ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বিষয়ের সীমা ৪৬, হালাল বা বৈধ বিষয় ৪৬, হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় ৪৬, মোবাহ-এর বিষয়াবলী ৪৭, সংস্কৃতির টার্গেট পরিশুদ্ধ জীবন ৪৮, ইসলাম ও সংস্কৃতি ৪৯, একজন মুসলমান ও অমুসলমানের পার্থক্য ৪৯, কিভাবে বিশ্বাস ও কর্মে পার্থক্য সৃষ্টি হয় ৫০, প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনায় ইসলামী সংস্কৃতির ভূমিকা ৫০, ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব ৫১, ইসলামে সংস্কৃতি চর্চা হবে কোন মাধ্যমে ৫১, ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার স্বরূপ ৫১, ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার ভিত্তি ৫২, তাওহীদ ৫২, রিসালাত ৫৪, আখিরাত ৫৪, ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি ৫৫, ইসলামী সংস্কৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতি ৫৭, ইসলামী আন্দোলন ও সংস্কৃতি চর্চা ৬২, দাওয়াতী কাজে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবহার ৬০, সাংস্কৃতিক কাজে পৃষ্ঠপোষকতা দান ৬২

www.icsbook.info

অধ্যায়-৬ : সাংস্কৃতিক আগ্রাসন (৬৪-৭০)

বাতিলের সাংস্কৃতিক হামলার লক্ষ্য ৬৪, সাংস্কৃতিক হামলার মাধ্যমসমূহ ৬৫, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পরিণতি ৬৬, সাংস্কৃতিক হামলা অন্য যে কোন হামলার চেয়ে ক্ষতিকর ৬৬, কতিপয় সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র ও তার প্রতিকার ৬৮

অধ্যায়-৭ : ইসলামের সাংস্কৃতিক কর্মসূচী (৭১-৭৯)

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চায় পরিবার প্রথা ৭১, মসজিদ ভিত্তিক সংস্কৃতি চর্চা ৭১, রেডিও টিভি ৭৩, সরকার পরিচালিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান৭৩, চলচ্চিত্র ৭৪, নাটক ৭৫, সাহিত্য ৭৫, সংগীত ৭৫, চারু ও কারুকলার বিস্তার ৭৬, শিল্পী-সাহিত্যিকদের সহায়তা ৭৭, সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান ৭৮, শাসনের এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে বিশ্ব ৭৮, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধে পুরনো দিনের প্রযুক্তি ৭৯, শেষ কথা ৭৯

সংযোজন–১ : ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্য চর্চা (৮০-৯৭)

কোরআনের আলোকে সাহিত্য চর্চা ৮০, সুন্নাহর আলোকে সাহিত্য চর্চা ৮৩, কবি পরিবারে নবীর আগমন ৮৩, কবি ও কবিতার প্রতি ভালবাসা ৮৪, কাব্য চর্চায় উৎসাহ প্রদান ৮৫, কাব্য চর্চায় সাহাবীদের ভূমিকা ৮৬, কাব্য জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ ৮৬, অশ্লীলতা বর্জনের নির্দেশ ৮৮, কাব্য বিচারে মহানবী (সা.) ৮৮, সমসাময়িক কবিদের কাব্য বিশ্লেষণ ৮৯, ঈমানদার কবিদের কাব্য সাধনার খোঁজখবর নেয়া ৯২, কবিদের ওপর আস্থা স্থাপন ৯১, বক্তৃতায় কবিতার ব্যবহার ৯১, তুলনামূলক অধ্যয়ন ৯২, রাসূলে করীমের কাব্য চর্চা ৯২, বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে কবিদের সহযোগিতা করা ৯৩, কবিদের খেতাব প্রদান ৯৩, কবিদের জন্য দোয়া করা ৯৪, কবিদের পুরস্কৃত করা ৯৪, কবিদেরকে তার প্রাপ্যের চেয়ে অধিক সুবিধা প্রদান ৯৫, কবিদেরকে অর্থ সাহায্য করা ৯৫, কবিদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদান ৯৬, কবিতার বিনিময়ে গনীমতের অংশ লাভ ৯৬, কাব্য চর্চার বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ ৯৬

সংযোজন–২ : ইসলামী সংস্কৃতি : সংক্ষিপ্ত আলোচনা (৯৮-১২৮)

www.icsbook.info

উৎসর্গ

ইসলামী সংস্কৃতির বাস্তবায়নে আজো যারা সমান তৎপর
আজো যারা স্বপ্ন দেখে সোনালী সূর্যোদয়ের

www.icsbook.info

www.icsbook.info

প্রেক্ষাপট

"সংস্কৃতি" ও "সাংস্কৃতিক আন্দোলন" শব্দ দু'টি স্বাধীনতা-উত্তর তরুণ ও যুব মানসে যতটুকু পরিচিতি ও প্রসারতা লাভ করেছে তার যথার্থ প্রকৃতি নিরূপণ ও স্বকীয় স্বরূপ সেই পর্যায়ে উন্মোচিত হয়নি। ফলে সংস্কৃতি সম্পর্কিত যথেষ্ট আলোচনা-পর্যালোচনা সত্ত্বেও একটি সুস্থ, সুন্দর, সৎ ও পরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক অঙ্গন বিনির্মাণের জন্য যে দিকনির্দেশনা দরকার ছিল, সাংস্কৃতিক কর্মীরা তা থেকে বঞ্চিত। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের কাছে আন্দোলন সম্পর্কিত নূন্যতম ও মৌলিক যে তথ্য ও জ্ঞানটুকু নিতান্ত অপরিহার্য অনেক ক্ষেত্রে সেটুকুও সঠিকভাবে পরিস্ফুট নয়। তদুপরি সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র ও অপ-সংস্কৃতির ধারক বাহকদের সুকৌশল অপতৎপরতার ফলে সাংস্কৃতিক কর্মীদের বিভ্রান্তি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিপথে পরিচালিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। তাই সংস্কৃতিসেবীদের আজ যথেষ্ট সচেতনতা প্রয়োজন।

সংস্কৃতি কি? স্বকীয় সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ কি? সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য কি? এসব মৌলিক প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা ব্যতিরেকে কোনক্রমেই একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা ও তা নির্ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে না। প্রথমেই প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বোধসমূহের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ; তারপরই আসে তার সফল বাস্তবায়নের প্রশ্ন! অনিবার্য প্রত্যয় বা ধারণাসমূহ মানসিক স্থিতি লাভ না করলে আন্দোলনের আবেগ ও তার শক্তি-সামর্থ্যের অপচয় রোধ অসম্ভব, কল্পনাতীত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের চিত্র ঐতিহাসিক সত্যতা সহকারে এখনো নির্ণীত হয়নি। হয়নি সমাজ, ধর্ম, অর্থ ইত্যাদির সাথে সংস্কৃতির সঠিক সম্পর্কের মূল্যায়ন। এমন কি সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রের সত্যনিষ্ঠ মুখোশ পর্যন্ত উন্মোচিত হয়নি। এ কথা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই যে, আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গন এখনো বন্ধ্যাত্বের শিকার। কোন কোন ক্ষেত্রে বিপথগামী ও ষড়যন্ত্রকারীদের হিংস্র থাবায় ক্ষতবিক্ষত। তাই সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কালো হাত বা অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক কর্মীদের সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। বাস্তবসম্মত, যুক্তিভিত্তিক ও পরিকল্পিত কর্মসূচী প্রয়োজন। একটি সুপরিকল্পিত ও সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সম্ভাব্যতা এখন সন্দেহাতীতভাবে স্বীকৃত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন নিরর্থক তেমনি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতির পক্ষে বিজাতীয় সংস্কৃতির গোলামী

www.icsbook.info

ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মেনে নেয়াও সম্ভব নয়। ফলে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন। এ আন্দোলন শুরু করতে হয় জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে। কারণ রাজনৈতিক গোলামীর চাইতে সাংস্কৃতিক গোলামী একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতির জন্য অধিকতর বিপদ ও ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক গোলামী বা স্বাধীনতার আগমন-নির্গমন নির্ভর করে কোন বিশেষ ঘটনার ওপর এবং হঠাৎ করেই তা ঘটে যেতে পারে।

কিন্তু সাংস্কৃতিক গোলামীর আগমন ঘটে অত্যন্ত ধীর গতিতে এবং এ গোলামীর শিকল ছিন্ন করার জন্যও প্রয়োজন হয় এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের। মূলত: এ শিকল একবার কোন জাতির গলায় আটকে গেলে তা ছিন্ন করা বড় দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। কেননা রাজনৈতিক পরিবর্তন বা স্থিতিশীলতা নির্ভর করে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কাঠামোর আলোচনার শুরুতে এ কথাগুলো আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বাংলাদেশের বর্তমান সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে সংস্কৃতির কয়েকটি ধারা আমাদের চোখে পড়বে। এর মধ্যে কোন ধারাটি মৌলিক, সঠিক এবং অধিকাংশ জনগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য তা খুঁজে দেখা প্রয়োজন। আমাদের স্বকীয় বা জাতীয় সংস্কৃতি বলতে এ ধারাটিকেই বুঝতে হবে এবং এটা বের করতে হবে গভীর নিরীক্ষা ও সুক্ষ্ম পর্যালোচনার মাধ্যমে।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চিন্তা-চেতনা, স্বপ্ন-কল্পনা, তাদের স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক প্রবণতা ও ধ্যান-ধারণা বিরোধী কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলন এদেশে শুধু ব্যর্থই হবে না বরং এমনি প্রচেষ্টা জনগণের সাথে বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। অতীতে বহুবার এ ধরনের প্রচেষ্টা চলেছে, বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। অধিকাংশ সংস্কৃতিসেবী নিজের অজ্ঞাতেই তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন। আর অনেক সময় তাদের চক্রান্ত এত নিখুঁত ও সুপরিকল্পিত ছিল যে, সংস্কৃতিসেবীদের সরলতা ও উদারতার সুযোগে যথাসময়ে তা পল্লবিত হয়ে উঠেছে। এ মুহূর্তেও আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গন এক সর্বাত্মক আগ্রাসন ও হুমকির সম্মুখীন। বিশেষত: আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী মহল-বিশেষের ঘৃণ্যতম নীলনকশা সম্পর্কে আমাদের সবিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। সুস্থ চিন্তা ও বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, আদর্শবাদী আন্দোলনের নেতা ও কর্মী এবং শাশ্বত আদর্শের ধারক বাহকদের সচেতন উপলব্ধিই নয় বরং সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর আজ তাই একান্ত প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটেই এ গ্রন্থটি রচিত।

www.icsbook.info

অধ্যায়-১

আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও চেতনার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

বাংলাদেশ নামে এ দেশটি জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ। প্রায় বার কোটি জনগণ অধ্যুষিত এ দেশের পূর্ণগঠনের দায়িত্ব দেশের প্রতিটি জনসাধারণের। রাজনৈতিক ও ভৌগলিক দিক দিয়ে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এদেশের সত্যিকার স্বাধীনতা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে এদেশের সাংস্কৃতিক কাঠামোর নির্মাণ ও তা সুসংহত করা অত্যাবশ্যক। আগেই বলেছি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন যেমন রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিরর্থক তেমনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোলামীও একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতির পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। ফলে স্বকীয় সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধের উজ্জীবন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও তার বিকাশ সাধন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরপরই শুরু হয় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন। এ আন্দোলন শুরু করতে হয় জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার বৃহত্তর স্বার্থেই। কারণ রাজনৈতিক গোলামীর চাইতে সাংস্কৃতিক গোলামী একটি মর্যাদাসম্পন্ন জাতির জন্য অধিকতর বিপদ ও ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাংস্কৃতিক গোলামীর শিকল একবার কোন জাতির গলায় আটকে গেলে তা ছিন্ন করা বড় দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রারম্ভিক কথাটা স্মরণ রেখেই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কাঠামোর আলোচনায় নামতে হবে।

এক্ষেত্রে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের বিশ্লেষণ অপরিহার্য। এজন্য অতীতের দিকে একবার চোখ ফেরানো দরকার।

আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

হিমালয়ান উপমহাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে ভাটির দেশ নামে খ্যাত বঙ্গোপসাগর উপকূলের এ জনপদটির সভ্যতার ইতিহাস অতি প্রাচীন। আর্য আক্রমণেরও অনেক পূর্ব থেকেই এখানে সভ্যতার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময় এখানে যারা বসবাস করতো তারা যে এদেশের আদি বাসিন্দা, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের সম্পর্কে ইতিহাস বলছে, তারা ছিল এক সুসভ্য জাতি।

www.icsbook.info

তাদের আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি ছিল অন্যদের ঈর্ষার বস্তু। তারা ছিল এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ধারক। মেগাস্তিনিস, গ্লিনি, প্লতর্ক, টলেমি প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকরা এ সভ্যতাধারীদের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। সুতরাং অনুমান করা চলে, তারা কতটুকু উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ছিল। শুধু হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদারোই নয় ইতিহাসের কাঠগড়ায় যুগ যুগ ধরে এ সাক্ষীটুকু দেয়ার জন্যই হয়তো দাঁড়িয়ে আছে ময়নামতির প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী।

এ নিদর্শন কাদের?

মূল আলোচনায় ঢোকার পূর্বে এদের পরিচয়টা একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ভূতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ফল থেকে জানা যায়, খৃষ্ট জন্মের বহু আগেই সুমের (খুব সম্ভবত: বর্তমান মিসর) দেশ এক ব্যাপক বন্যার শিকার হয়। সম্ভবত মানব সভ্যতার আদি কেন্দ্র এই সুমের দেশ। কি করে এ ব্যাপক বন্যার ছোবল থেকে সেদিন তারা রক্ষা পেয়েছিল এ প্রশ্নটা ঐতিহাসিকদের ভাবিয়ে তোলে। এর জবাব পাওয়া গেল মহাগ্রন্থ আল কোরআনে। কোরআন একে নূহ নবীর আমলের বন্যা বলে অভিহিত করেছে। কোরআনের মতে আল্লাহ বিশ্বাসীরা সেদিন নূহ নবীর জাহাজে চড়ে আত্মরক্ষা করেছিল। ঐতিহাসিকরা এ সত্যটা স্বীকার করে নিয়ে একে কোরআন ও বাইবেলে বর্ণিত প্লাবন বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন মৃৎ চাকতিতে এ মহাপ্লাবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে মেসোপটিমিয়ায় আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে দেখা যায়, এ মহাপ্লাবন আট ফুট পুরো পলিমাটির স্তর সৃষ্টি করে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা মতে, এ মহাপ্লাবনের ফলে পলি স্তরটির নীচের ও উপরের স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে একটি পূর্ণচ্ছেদ দেখা যায়। বুঝা যায়, তাতে প্রাক-প্লাবন কালের সংস্কৃতি জলমগ্ন হয়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে এবং সেখানে প্লাবনোত্তরকালের একটি নতুন সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই বলা যায়, এ সংস্কৃতি হযরত নূহের গড়া সংস্কৃতি। প্লাবনের পরে তারাই পত্তন করলেন আজকের মানব গোষ্ঠীর। হযরত নূহের এক পুত্রের নাম ছিল সাম। মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম সেমেটিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে তার নামানুসারেই। সামের পৌত্র আবিরের পিতার নাম আরফাখশাজ। আবিরের পুত্র য়্যাকতীনের ঘরে জন্ম নেয় আবু ফীর। এই আবু ফীর সভ্যতার গোড়াপত্তন করতে প্রথমে এলেন সিন্ধু এবং তারপর আরেকটু এগিয়ে গংগার তীরে। যে সমৃদ্ধ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের ওপর বহিরাগত আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটেছে ইতিহাস তাকে আখ্যায়িত করেছে দ্রাবিড় সভ্যতা বলে। দ্রাবিড় সভ্যতার গোড়াপত্তনকারী আবু ফীর হযরত নূহের সপ্তম স্তরের পুরুষ।

আরবী ভাষায় ঘরকে বলা হয় দ্বার। আবু ফীর ও তার বংশধরদের আবাস স্থল

www.icsbook.info

কালক্রমে 'দ্বার আবু ফীর' থেকে দ্রাবিড়ে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে ইতিহাসে এরা দ্রাড়ির জাতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে ভারতীয় উপমহাদেশের আদি বাসিন্দার মর্যাদা পায়। পৃথিবীর এ ভূখণ্ডে মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন তাদের অক্ষয় কীর্তি। হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদারোর যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায় দ্রাবিড়রাই তার নির্মাতা।

এ প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশ এক গৌরবময় ও সমৃদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অত্যন্ত উন্নত ও সম্মানজনক। যে ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে বাংলাদেশকে গৌরবান্বিত ও সৌভাগ্যবান ভাবা যায়। যে ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্বের লজ্জাজনক পরিবেশকে উপেক্ষা করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যায়।

বাংলাদেশের আদি সংস্কৃতি

মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব খাটানোর ঘৃণ্য ব্যাধি সভ্যতার ইতিহাসের কলংক। সম্প্রসারণবাদ, আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন চলছে দিনের পর দিন। এ আগ্রাসনের ফলে প্রভুত্বের পরিধি বাড়ছে কতিপয় শক্তিমানের। লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার। দুর্বলরা হচ্ছে গোলামীর শৃঙ্খলাবদ্ধ।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এদেশের মানুষ প্রথম গোলামীর শিকার হয় বহিরাগত আর্য আক্রমণকারীদের হাতে। সমৃদ্ধ সভ্যতা সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বাংলার আদি বাসিন্দা দ্রাবিড়দের পরাজিত করে আর্যরা প্রথমবারের মত তাদের মুখে লেপন করে কলঙ্কের কালি। তার পরের ইতিহাস আবর্তন-বিবর্তনের। মুক্তিকামী মানুষ একেকবার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে, ষড়যন্ত্রকারী জাতীয় বেঈমানরা তা বিকিয়ে দেয় স্বার্থের প্রলোভনে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সংস্কৃতি কমিশনের ভাষ্য– "আর্যরা ভারতবর্ষে আগমন করেছিল একটি নতুন সংস্কৃতি নিয়ে। সমগ্র উত্তর ভারত তাদের করায়ত্ত হয়েছিল। তাদের প্রভাব ও অহমিকায় ভারতবর্ষে একটি নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল। তারা আনুগত্যের আহবান জানিয়েছিল সকল জাতিকে এবং মানবগোষ্ঠীকে। যে জাতি তাদের এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেছিল তারা বঙ্গজাতি। এই প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে একটি দুর্দান্ত সাহস আমরা লক্ষ্য করি। আমাদের সংস্কৃতির উৎসমূলে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রত্যাখানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল সে ইতিহাস আমাদের জানা নেই, তবে আমরা অনুভব করতে পারি যে, আপন অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমাবন্ধনকে অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য তারা নিজস্ব সত্তার মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে চেয়েছিল; যার ফলে এ অঞ্চলের সমাজ বন্ধন এবং ভাষার

www.icsbook.info

বিকাশ আর্যাবর্তের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে ভিন্নতর হয়েছিল। এই ভিন্নতা সবসময় রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি, কিন্তু যতটা সম্ভব আপন স্বকীয়তা বজায় রাখার চেষ্টায় এতদঞ্চলের মানুষ অনেকটা সফলকাম হয়েছিল।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিকাশের একটি পর্যায়ে বহিরাগত সেন রাজারা একটি নিষ্ঠুর অহমিকা সংক্ষুব্ধ আগন্তুক হিসাবে এ অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থা বিনষ্ট করতে চেয়েছিল, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ইখতিয়ার উদ্দীন বখ্‌তিয়ার খিলজির আগমনের ফলে সেনদের প্রভাব প্রশমিত হয় এবং একটি নতুন সংস্কৃতির সম্ভার আমরা অর্জন করি। সেনদের আমলে সংস্কৃতি ছিল এতদঞ্চলের মানুষের ওপর শাসনের প্রভাবে আরোপিত একটি সংস্কৃতি। সেনরা এদেশে শ্রেণীভেদ প্রথা নতুন করে প্রবর্তন করেন, অপভ্রংশের পরিবর্তে সংস্কৃতকে নতুন ভাষা হিসেবে প্রচলিত করেন এবং উপাসনার জন্য নতুন স্থাপত্যরীতির গৃহ নির্মাণ করেন। আর্যরা জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন, স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন এবং গণতন্ত্রের অধিকার লুপ্ত করেছিলেন। আর্যদের সময়ের জাতিভেদ এ অঞ্চলে দানা বাঁধতে পারেনি।"

বৈদিক আর্যদের সময়ে যে অঞ্চল নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ সে অঞ্চলের সঙ্গে আর্যদের কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বৈদিক সূত্রে এ অঞ্চলের উল্লেখ নেই 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'। এ অঞ্চলের লোকদের 'অনার্য এবং দস্যু' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ঐতয়ের ব্রাহ্মণে' পুণ্ড্র বলে একটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। এই পুণ্ড্র ছিল উত্তরবঙ্গের নাম। তেমনি 'ঐতয়ের আরণ্যকে' এ অঞ্চলের লোকদের সম্পর্কে নিন্দাসূচক উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের শেষে রচিত 'বৌধায়ন ধর্মসূত্রে' পুণ্ড্র এবং বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে যেখানে বলা হয়েছে যে, আর্যরা ওসব অঞ্চলে গেলে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

বৈদিক যুগের এ সমস্ত শাস্ত্রীয় উল্লেখের সাহায্যে এ সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, বঙ্গদেশ আর্য প্রভাবের বাইরে ছিল। স্থানীয় লোকেরা তাদের নিজস্ব সত্তা নিয়ে বহিরাগত আর্যদের আক্রমণ প্রতিহত করেছে কিন্তু যেহেতু আর্যরা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ভারতের সর্বত্র অগ্রসর হয়েছিল তাই এ অঞ্চলের লোকেরা আর্যদের সঙ্গে সর্বদাই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতো। পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর ভারতের আর্যগণ বহুবার এ অঞ্চলকে করায়ত্ত করতে চেয়েছে। কখনও কখনও সফলকামও হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারেনি। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বঙ্গ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীগণ আর্য জাতীয় ছিলেন না।

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র সেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষার রূপকল্প বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আর্যগণ এদেশে আসার পূর্বেই বিভিন্ন জাতি এদেশে বসবাস করতো তার স্বাক্ষর বর্তমান বাংলা ভাষাতেও বিদ্যমান। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো কোল, মুণ্ডা, শবর, পুলিন্দ, আড়ী, ডোম প্রভৃতি যে সমস্ত জাতি দেখা যায় এরা সেই

www.icsbook.info

আদিম অধিবাসীদেরই বংশধর। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাবের কথা বলেছেন। কালক্রমে এ অঞ্চলে তিব্বতী মোঙ্গলরা এসেছে, বর্মীরা এসেছে এবং সেমেটিক জাতিভুক্ত আরবরা এসেছে। সংস্কৃতি এবং ভাষার ক্ষেত্রে এ সমস্ত জাতি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। চর্যাগীতিকা এবং সরহপার 'দোহাকোষে' শবর, ডোম, হাড়ী, চণ্ডাল এবং নিষাদ জাতীয় মানুষদের কথা আছে। অবশ্য ব্রাহ্মণদের কথাও আছে। সরহপার রচনায় ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক কোন উক্তি নেই।

এটা সুস্পষ্ট যে, আর্যদের সঙ্গে বঙ্গ অঞ্চলের মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। তার প্রমাণ, বৈদিক ধর্মের অনেক নীতি এবং নির্দেশনা বঙ্গ অঞ্চলে অনুপস্থিত ছিল এবং অদ্যাবধি অনুপস্থিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামীণ ভূভাগের স্থানিক নাম বিশুদ্ধ আর্য নাম নয়। এ সমস্ত অঞ্চলের জনপদ-নামের বিস্তারিত কোন আলোচনা হয়নি। আলোচনা হলে ধরা পড়তো যে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতেও আর্য সভ্যতা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্ণভাবে প্রবেশ করতে পারেনি।

পাল বংশের উৎপত্তি

সপ্তম শতকে বঙ্গ অঞ্চলে বহিরাগত আর্যদের আক্রমণ এবং অন্যবিধ বহিঃশত্রুর আগমনে বাংলার রাজতন্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। সমগ্র দেশে কোন স্থির শাসন ছিল না। এর ফলে লোকের দুঃখ দুর্দশার সীমা ছিল না। দেশে অরাজকতা ছিল প্রবল এবং অনবরত দুর্বলের ওপর অত্যাচার হত। এই বিশৃংখল অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য বঙ্গদেশীয় জনসাধারণ যে বিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। দেশের প্রবীণ নেতাগণ স্থির করলেন যে, পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ ভুলে তারা একজনকে রাজপদে নির্বাচন করবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তার শাসন মেনে নেবেন। দেশের জনসাধারণ এই সিদ্ধান্ত মেনে নিল। এর ফলে গোপাল নামক এক ব্যক্তি বাংলাদেশের রাজপদে নির্বাচিত হলেন। গোপালই প্রথম যথার্থ বঙ্গবাসী যিনি পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটান এবং একটি স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এই পাল রাজবংশের সময়েই বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ব্যাপক উন্নতি ঘটে। পাল বংশের এ শাসকরা ছিল বৌদ্ধ।

বৌদ্ধ তথা পাল যুগটি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়কালে জাতিভেদ প্রথার বিলোপ ঘটে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন ঘোষিত হয়। বিস্ময়কর চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য এ অঞ্চলে গড়ে ওঠে। সর্বোপরি, বৌদ্ধ বিনয়, তৃষ্ণাহীনতা, সাম্য এবং সমতার একটি আদর্শ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উপরে ছিল ভাষা। জনসাধারণের সহজাত আনন্দ এবং আগ্রহকে বহমান করার জন্য একটি পূর্ব অপভ্রংশ এখানে গড়ে উঠেছিল। এই জনসাধারণের ভাষা এখানকার সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হয়েছিল। অর্থাৎ এক কথায় এ অঞ্চলের মানুষের মানসপ্রক্রিয়া গঠনের জন্য একটি মার্জিত রুচির

www.icsbook.info

সংস্কৃতি এখানে গড়ে উঠেছিল। ভাষা সংস্কৃতিকে ধারণ করে এবং তাকে বহমান এবং প্রকাশিত রাখে। এ সময়কার দোহা-বন্ধগুলো এবং গীত-বন্ধগুলো তখনকার সংস্কৃতিকে রূপ দিয়েছে এবং সজীব করেছে। বাংলাদেশের পরবর্তী কালের সংস্কৃতি এ পাল রাজত্বকালের সংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

সেন আগমনে বিপর্যস্ত সংস্কৃতি

পালদের পরে বহিরাগত সেনরা এসে এদেশকে নিজেদের অধিকারে রেখেছিল। খুব দীর্ঘকাল না হলেও প্রায় পঁচাত্তর বৎসর তারা এ অঞ্চল শাসন করেছিল। এখানকার মানুষকে স্বধর্মচ্যুত করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল এবং কর্ণাটক এবং কর্ণকুঞ্জ থেকে সংস্কৃতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ এনে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছে। এরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তন করে বৌদ্ধদের উৎখাত করার চেষ্টায় সকল শক্তি নিয়োগ করেছিল। এ উৎখাত প্রচেষ্টায় তারা যে কঠোরতার নিদর্শন রেখে গেছে তা বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

অল্প সময়ের মধ্যে সেন রাজাদের শাসনামলে রাজ দরবারের গৃহীত নীতি হিসাবে সংস্কৃত উচ্চবিত্তদের আসরে স্থান লাভ করে। রাজ দরবারে সংস্কৃত ভাষার কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্থান হয় এবং রাজ আনুকূল্যে একটি তথাকথিত অভিজাত সংস্কৃতি এ দেশের ওপর আরোপিত হয়।

আরোপিত সংস্কৃতি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে বেশী, কিন্তু হারিয়ে গেলেও কিছুটা রেশ যে রেখে যায় না তা নয়। একটি বিশেষ কারণে এই রেশ বিদ্যমান ছিল। জয়দেব যে সংস্কৃত ভাষায় তার কাব্য রচনা করেছিলেন তার ভঙ্গি ছিল সহজবোধ্য এবং আকর্ষণীয়। জয়দেবের কাব্যের ললিত-তরল-ভঙ্গি জনসমাজে সম্মোহন সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। একে তো রাজ-আনুকূল্য এবং প্রচারণা বিদ্যমান ছিল, তদুপরি জয়দেবের নিজস্ব নাগরিক বৃত্তি এবং কৌশল তাকে জনসমর্থনের সুযোগ দিয়েছিল। তাঁর 'গীতগোবিন্দ'কে অবলম্বন করে এ অঞ্চলে ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং নৃত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এগুলোর নিদর্শন পরবর্তীতে হারিয়ে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু একসময় যে ছিল তা ধারণা করা যায়। জয়দেবের প্রভাব পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিল, যেমন উড়িষ্যায় উড়িষী নৃত্য। বঙ্গ অঞ্চলে মনিপুরী নৃত্য জয়দেবের প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে রাজনৈতিক কারণে সেন রাজাদের অবক্ষয় ঘটে এবং ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজীর আগমনের পর সেনদের প্রভাব ক্রমশ: মুছে যেতে থাকে।

মুসলিম আগমন : রাহু মুক্তি

বখতিয়ার খিলজি একটি নতুন বিশ্বাস এবং চৈতন্য বঙ্গ অঞ্চলে নিয়ে আসেন যার

www.icsbook.info

সঙ্গে এই ভূখণ্ডের লোকদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সম্পর্ক দীর্ঘদিন অবলুপ্ত ছিল। এদেশে মুসলমানরা এসেছে পূর্বেই, কিন্তু ব্যাপকভাবে তাদের প্রভাব অনুভূত হয়নি। এই প্রথম বার একটি সম্পূর্ণ নতুন সভ্যতার সঙ্গে বঙ্গবাসীর পরিচয় হল। মুসলমানদের আগমনের ফলে এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হল। একটি নতুন স্থাপত্য রীতি এদেশে গড়ে উঠলো যা দৃশ্যত শোভন এবং ব্যবহার উপযোগিতায় আদর্শস্থল। সারা দেশে মসজিদ নির্মিত হতে লাগলো এবং মসজিদের গঠন প্রণালী একটি নতুন স্থাপত্য রীতির প্রবর্তন করলো।

মুসলমানরা বঙ্গ ভূখণ্ড দখল করার পর এ অঞ্চলের সংস্কৃতির বিপুল পরিবর্তন ঘটে। সেন আমলে সংস্কৃত ভাষার যে প্রভাব ছিল সেই প্রভাব দূরীকৃত হয় এবং তার পরিবর্তে আরবী ভাষার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপিত হয় এবং ধর্ম সাধনার জন্য 'খানকাহ' এবং 'মসজিদ' স্থাপিত হয়। বখতিয়ার খিলজি তাঁর স্বল্প সময়ের রাজত্বকালে এই পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বখতিয়ার খিলজির আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে নতুন নতুন নগর নির্মাণ। এভাবে নগর নির্মাণের সাহায্যে একদিকে যেমন নতুন সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছিলেন অন্যদিকে তেমনি এদেশীয় গ্রামীণ-সংস্কৃতি-ধারার মধ্যে পরিবর্তন এনেছিলেন। সেন আমলে জাতিভেদ প্রথার প্রভাবে নিম্ন বর্ণের সাধারণ মানুষরা খুবই উৎপীড়িত ছিল। মুসলমান আগমনের ফলে এর উৎপীড়ন বন্ধ হবার সুযোগ ঘটে এবং সমাজে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ অসমর্থিত হতে থাকে।

বখতিয়ার খিলজির আগমনকে নিম্নবর্গের হিন্দুরা স্বাগত জানিয়েছিল। বিভিন্ন কারণে নিম্নবর্গের হিন্দুরা লক্ষণ সেনের শাসনের প্রতি ছিল ক্ষুব্ধ।

প্রথমত: সেনরা ছিল বহিরাগত এবং তারা বহিরাগত ব্রাহ্মণ এনে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন উৎপাদন করেছিল। দ্বিতীয়ত: দেশী মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চার বিরুদ্ধে এদের কঠোর নির্দেশ ছিল। নরকে নিক্ষিপ্ত হবার ভয় দেখিয়ে দেশী ভাষার চর্চা থেকে এরা মানুষকে বিরত রাখবার চেষ্টা করতো। তৃতীয়ত: রাজ দরবারের ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ফলে সংস্কৃতির নতুন একটি উচ্চমার্গ জন্ম লাভ করে, যার সঙ্গে নিম্নবিত্ত মানুষদের সংস্কৃতির কোন যোগাযোগ ছিল না। চতুর্থত: নগরের যে পরিকল্পনা এদের ছিল সে নগর ছিল সীমাবদ্ধ এবং সংকীর্ণ। নিম্নবিত্তদের বাসস্থান ছিল নগরের বাইরে অর্থাৎ নগর ছিল সম্মানিত মানুষদের জন্য এবং ব্রাহ্মণদের জন্য।

এভাবে সাধারণ মানুষকে দেশের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার যে প্রবণতা গড়ে ওঠে সে প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবেই সাধারণ মানুষ বখতিয়ার খিলজির আগমনকে স্বাগত জানিয়েছেন। অর্থাৎ এ অঞ্চলের সংস্কৃতি বখতিয়ারের আগমনের পর একটি নতুন রূপব্যঞ্জনা লাভ করে।

ফলে মুসলমানদের শাসন আমলে এদেশে সংস্কৃতির নতুন দ্বার উন্মোচিত হয় এবং পাল আমলের মত নতুন করে মাতৃভাষার চর্চা চলতে থাকে। পালদের ধর্মীয় ভাষা

www.icsbook.info

ছিল পালী। ধর্মীয় অনুশাসন এবং ধর্মগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্র পালিভাষা ব্যবহার করলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা লোক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। তেমনি মুসলমান আমলে ধর্মীয় ভাষা 'আরবী' এবং দরবারের ভাষা 'ফারসী' হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার চর্চায় মুসলমান রাজন্যবর্গ উৎসাহ প্রদান করেছেন। এই সময়কালেই বাংলা ভাষার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফারসী শব্দ এবং ফারসীর মাধ্যমে আরবী এবং তুর্কী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করতে থাকে। এভাবে দু'হাজারের অধিক ফারসী, আরবী ও তুর্কী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে।

মুসলিম আগমনে সংস্কৃতির নবরূপায়ন

মুসলমান আমলে বঙ্গভূখণ্ডে সংস্কৃতির যে পরিবর্তন সূচিত হয় তার স্বভাব ও প্রকৃতি নিম্নরূপ:

১. মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে একটি সাম্যবাদী প্রবৃত্তির প্রতিষ্ঠা।

২. নগরায়নের মাধ্যমে সংস্কৃতির গ্রামীণ প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন সাধন।

৩. স্থাপত্যশিল্পে নতুন মাত্রা সংযোজন। মসজিদ ও দুর্গে স্থাপত্য রীতির প্রবর্তন।

৪. শিল্পক্ষেত্রে ক্যালিগ্রাফি বা আরবী হস্তলিখন রীতির প্রবর্তন।

৫. দেশজ ভাষার চর্চায় উৎসাহ প্রদান এবং একটি উদার অসাম্প্রদায়িক ভাব প্রকল্পের জন্ম দান।

৬. বাংলা ভাষার রূপ ও রীতির পরিবর্তন এবং প্রচুর পরিমানে ফারসী-আরবী-তুর্কী শব্দের অনুপ্রবেশ।

বঙ্গ দেশে মুসলিম শাসন ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে স্বাধীন সুলতানী আমল এবং মোঘল শাসন ছিল। মোটামুটিভাবে এই সময়ের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ, জীবন চেতনা, অনুসন্ধিৎসা, সামাজিক ব্যবহার বিধি, রাজনৈতিক প্রশাসন এবং বিশিষ্ট ধরনের শিল্পচর্চা এদেশের জীবনে রূপলাভ করে। বাংলা ভাষার পরিবর্তন ঘটে এবং বাংলা ভাষায় বর্ণিত জীবন কাহিনীর মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ এবং জীবন চেতনার স্বাক্ষর ধরা পড়ে। এক কথায় বলতে গেলে, ইসলাম পরিপূর্ণভাবে এদেশের সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথম থেকেই ধর্ম প্রচারণার ক্ষেত্রে মুসলমান সূফী সাধকরা এদেশে এসেছিলেন। তাঁদের ঔদার্য, মানবহিতৈষণা, জনকল্যাণ, সকল মানুষের প্রতি সমদৃষ্টি এদেশের প্রজ্ঞায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করে।

সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র : সূচনা ও ক্রমবিকাশ

পালদের উৎখাতের মাধ্যমে সেনদের আগমন ঘটলে প্রথম এ দেশের সংস্কৃতিতে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সেনরা সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি চর্চায় প্রতিরোধ

www.icsbook.info

সৃষ্টি করে সাধারণ জনগণকে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তারা মন্দির ও রাজসভা ভিত্তিক উচ্চমার্গ সংস্কৃতি প্রবর্তনের জন্য সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রের সূচনা করে এবং আগ্রাসী ভূমিকা নেয়। তাই দেখা যায়, সেন আমলের সংস্কৃতি ছিল মন্দির এবং রাজসভা ভিত্তিক। সেন রাজারা এদেশের মানুষের সংস্কৃতিগত প্রেরণাকে অগ্রাহ্য করে শাসকবর্গ এবং মন্দিরের পুরোহিতদের জন্য একটি সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল। ফলে ধ্রুপদী সঙ্গীত ও নৃত্য রাজসভা এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। মুসলমান আমলে এই রাহুগ্রাস ছিন্ন হয় এবং আবার জনজীবন ভিত্তিক নতুন সংস্কৃতি রূপলাভ করতে থাকে। এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন আমরা দেখি সুলতান হোসেন শাহের আমলে।

হোসেন শাহের আমলে ইসলামের মানবতাবাদে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মুসলমান হওয়া শুরু করলে তা প্রতিরোধের জন্য শ্রী চৈতন্য দেবের আবির্ভাব ঘটে। এর ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা হিন্দুধর্মের সনাতনী বর্ণবাদী শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। চৈতন্যদেব নিজে উচ্চবর্ণের লোক হলেও তিনি সাধারণ মানুষের কাছে এসেছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রেমধর্মের একটি প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন। হোসেন শাহ চৈতন্যদেবের ধর্ম সাধনায় সহায়তা করার জন্য রামকেলি নামক একটি গ্রাম চৈতন্যের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তিনি মানুষে মানুষে ঐক্য এবং সম্প্রীতি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এবং সে ক্ষেত্রে রাজ-আনুকূল্যও তিনি পেয়েছিলেন। হোসেন শাহের ঔদার্যে এবং সহানুভূতিতে এদেশের সকল সম্প্রদায় মিলিতভাবে বসবাস করতে সক্ষম হয়েছিল। সে কারণে তাঁকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা 'নৃপতি তিলক' এবং 'জগতভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

হোসেন শাহের দরবারে 'সনাতন' এবং 'রূপ গোস্বামী' মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছিলেন। এরাই পরে শ্রী চৈতন্যের শিষ্য হন এবং সূফী মতবাদের সঙ্গে বৈষ্ণব মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। রূপগোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বল নীল মনি' গ্রন্থে শ্রী চৈতন্যের সাধন পদ্ধতিকে এমন একটি রূপরেখা দান করেন যা মূলত: সূফী সাধন পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। বঙ্গের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির এই মিশ্রণটি অভূতপূর্ব। চৈতন্যের নৃত্য গীত সাধারণ মানুষকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল। সেন আমলের কুসংস্কার এবং বন্ধন দশা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য চৈতন্যের চেষ্টা চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এক প্রকার সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি হোসেন শাহের আমলে চৈতেনের প্রভাবে গড়ে ওঠে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

এদিকে পলাশী যুদ্ধের পর এদেশে পূর্ণভাবে ইংরেজী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের হাতে গ্রহণ করে। এদেশে সংস্কৃতির মধ্যে তখন থেকেই পরিবর্তন আসতে থাকে। ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা রাজভাষা রূপে গৃহীত হয়। প্রশাসনিক কাঠামোর

www.icsbook.info

মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সুচিত হয়।

মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ার ফলে হিন্দুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দ্রুত ছুটে গিয়ে ইংরেজদের সাথে বন্ধুত্ব পাতায়। স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজ আনুকূল্যপ্রাপ্ত হিন্দুদের থেকে মুসলমান সমাজ অনেক পিছিয়ে পড়ে। তারা পরাজয়ের দুঃসহ অবস্থাকে অনেক দিন স্বীকার করে নিতে পারেনি। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাঙালী হিন্দু সমাজকে উদার আহবান জানান রামমোহন। সমাজ ও ধর্মসংস্কারে এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সে যুগে যে তীক্ষ্ণ মুক্তবুদ্ধি ও মনীষার পরিচয় তিনি দেন, নব্য হিন্দু ভারতে তার তুলনা খুব বেশী নেই।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সিভিলিয়ানদেরকে এ দেশের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত করার এবং এ দেশের ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ (অধুনা প্রেসিডেন্সী কলেজ)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা এবং বাংলা গদ্য সৃষ্টির কাজ উপলক্ষে এ দেশের হিন্দুরা ইংরেজদের সংস্পর্শে আসে। এর পরে হিন্দু কলেজে বাঙালী হিন্দুদেরকেই লেখাপড়া শিখতে দেখা যায়।

মুসলমানরা হিন্দুদের অনেক পরে ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ করতে শুরু করে। এই বিলম্বের কারণে মুসলমানগণ শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর এবং পশ্চাদপদ হয়ে পড়ে।

এ সময় আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রভূমির পরিবর্তন ঘটায়। পলাশী যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রাজধানী মুর্শিদাবাদই ছিল সমগ্র বাংলাদেশের প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। রাজশক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে মুর্শিদাবাদকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক জীবন নিঃশেষিত হয় এবং নতুন রাজধানী কোলকাতাকে কেন্দ্র করে নতুন সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে ওঠে। অবস্থাগত কারণে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ব্যবধান প্রবল হতে থাকে এবং এ সাংস্কৃতিক পটভূমিতে হিন্দুদের প্রাধান্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের পটপরিবর্তন ঘটে।

এ ধারা অব্যাহত থাকে দুশো বচর। এ সুদীর্ঘকাল ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের সমাজ জীবনে পাশ্চাত্য প্রভাব এসেছে এবং দেশীয় সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। এভাবেই ব্রাহ্মণ্যবাদী ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এদেশের সমাজ জীবনে অনুপ্রবেশ করে।

স্বাধীনতা-উত্তর সংস্কৃতি

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সংস্কৃতি এখনো বন্ধ্যাত্বের শিকার। এর জন্য দায়ী অতীত থেকে চলে আসা সুগভীর ষড়যন্ত্র। এ দেশের শতকরা আশি জন মানুষের

www.icsbook.info

কাছে সংস্কৃতি শব্দটি এখনো অপরিচিত। বাকী জনসমষ্টির অধিকাংশই সংস্কৃতি বলতে বুঝে নাচ, গান, যাত্রা, সিনেমা, বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদিকে। অথচ এটা সংস্কৃতির অপব্যাখ্যা। সংস্কৃতি সম্পর্কিত এ ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন না করে সাংস্কৃতিক আন্দোলন এগিয়ে নেয়া যাবে না। গুটিকয় বুদ্ধিজীবী, যাদের কাছে সংস্কৃতির সঠিক সংজ্ঞা পরিষ্কার, এ ভ্রান্তি নিরসনে তাদের কাছ থেকেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বা পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু কয়েকটি মৌলিক কারণে তা হয়নি।

প্রথমত: যুদ্ধকালীন সময়ে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশকে আমরা চিরতরে হারিয়ে ফেলি। যারা বেঁচে থাকলে এক্ষেত্রে অনেক কিছু করতে পারতেন।

দ্বিতীয়ত: যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে যে নৈরাজ্য দেখা দেয় তাতে পরিবেশের চাপে পড়ে অনেকটা বাধ্য হয়েই বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশ বিদেশে পাড়ি জমান। সেখানে তাদের কর্মসংস্থান হয়ে যাওয়ায় এবং দেশে ফেরার ব্যাপারে জটিলতা দেখা দেয়ায় এখনো অনেকে বিদেশে কাটাচ্ছেন। ফলে তাদের কাছ থেকে জাতি যে সার্ভিস পেতে পারতো তা থেকে বঞ্চিত হতে হলো।

তৃতীয়ত: এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশ আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রকারীদের দোসর হিসাবে এ দেশে কাজ করছে। তারা দেশের মাটির মানুষের সেবা করার চাইতে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদীদের দালালী বা গোলামীকেই নিজেদের জন্য অধিকতর কল্যাণজনক মনে করে। এসব বিজাতীয় সংস্কৃতির সেবাদাসদের বদৌলতে জাতীয় সংস্কৃতি এক মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন।

চতুর্থত: এরপরও যেসব গুটিকয় বুদ্ধিজীবী এ ধরণের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছেন তারা সংখ্যায় নগণ্য। আর ক্ষমতাধর এসব অপসংস্কৃতির সয়লাব দেখে ভীত শঙ্কিত। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তারা নির্জীব। তারা অগ্নি প্রজ্বলিত ঘরে চোখ বন্ধ করে ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন।

এ অবস্থায় যারা দেশে একটি সুস্থ, সুন্দর, সৎ ও পরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক অংগন নির্মাণের আকাঙ্খা পোষণ করেন তাদেরকে পেরোতে হবে অনেক চড়াই উৎরাই, দিতে হবে ত্যাগের কঠিন পরীক্ষা। সংস্কৃতি সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাগুলোর মূলোৎপাটন করে সংস্কৃতির আসল পরিচয় তুলে ধরতে হবে জাতির সামনে।

www.icsbook.info

অধ্যায়-২

সংস্কৃতির সংজ্ঞা

বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি

সংস্কৃতি সাধারণত: তাহযীব, তমুদ্দুন বা ইংরেজী কালচারের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়।

আবুল মনসুর আহমদ বলেন: "ইংরেজীতে যাকে বলা হয় রিফাইনমেন্ট, আরবীতে যাকে তাহাযীব বলা হয়, সংস্কৃতি শব্দটা সেই অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে।"

আবুল ফজল বলেন: "কালচার শব্দের ধাতুগত অর্থ কর্ষণ অর্থাৎ সোজা কথায় চাষ করা। জমি রীতিমত কর্ষিত না হলে যত ভাল বীজই বপন করা হোক না কেন তাতে ভাল ফসল কিছুতেই আশা করা যায় না। মন জিনিসটাও প্রায় জমির মতই। মনের ফসল পেতে হলে তারও রীতিমত কর্ষণের প্রয়োজন।"

এক কথায় সংস্কৃতির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন বিশ্লেষণের। নীচে সংস্কৃতি সম্পর্কিত এমন কতকগুলো উদ্ধৃতি পেশ করা হলো যাতে সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ধারণা অর্জন সহজতর হতে পারে। আসলে বুদ্ধিজীবীদের এ সমস্ত উদ্ধৃতি পড়ে যে ধারণাটি আমাদের মনে জন্মলাভ করবে, সংস্কৃতি মূলত: তাই।

ডঃ আহমদ শরীফ-এর মতে: "culture বা সংস্কৃতি একটি পরিশ্রুত জীবন চেতনা। ব্যক্তি চিত্তেই এর উদ্ভব ও বিকাশ। এ কখনো সামগ্রিক বা সমবায় সৃষ্টি হতে পারে না। এ জন্য দেশে-কালে-জাতে এর প্রসার আছে কিন্তু বিকাশ নেই। অর্থাৎ এ জাতীয় কিংবা দেশীয় সম্পদ হতে পারে কিন্তু ফসল হবে ব্যক্তি মনের। কেননা সংস্কৃতি ও কাব্য, চিত্র ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার মতো স্রষ্টার সৃষ্টি। কৃতিত্ব স্রষ্টার বা উদ্ভাবকের। তা অনুকৃত বা অনুশীলীত হয়ে দেশে পরিব্যাপ্ত ও জাতে সংক্রমিত হতে পারে এবং হয়ও। তখন কালচার হয় সাধারণের সম্পদ ও ঐতিহ্য এবং পরিচিত হয় দেশীয় বা জাতীয় সংস্কৃতি নামে। যেমন হযরত মুহম্মদের (সা.) জীবনে ও বাণীতে যে সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছে তাই ইসলামী বা মুসলিম সংস্কৃতি বলে পরিচিত।"

www.icsbook.info

তিনি আরো বলেন: "সাংস্কৃতিক প্রেরণার মূলে রয়েছে সৌন্দর্য অন্বেষা। কেউ কেউ বলেন, পশুপ্রায় মানুষ যেদিন ফুলের সৌন্দর্য ও সুরের মাধুর্যে আকৃষ্ট হল, মুগ্ধ হল, সে দিনই হল মনুষ্যত্বের উন্মেষ। সে থেকে মনুষ্যত্বের ও সংস্কৃতি-সভ্যতার শুরু। কেননা সেদিনই মানুষ অনুভব করে, তার মন বলে একটা আশ্চর্য বৃত্তি রয়েছে, যার শক্তি ও সম্ভাবনার সীমা নেই। অতএব মনুষ্যত্বের পরিচয় সৌন্দর্য চেতনায় ও পিপাসায়। সংস্কৃতিরও অন্য নাম সৌন্দর্য চেতনা ও অন্বেষা। সংস্কৃতিবান এই সুন্দর ও কল্যাণের সাধক। সংস্কৃতিবান জীবনের রূপদক্ষ শিল্পী। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর ও শোভন অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।"

তিনি আরো বলেন: "সংস্কৃতিবান কখনো অসুন্দরের সংগে আপোষ করতে জানে না। তার চিন্তা, কর্ম ও আচরণ অন্যায় ও অকল্যাণ প্রসূ নয়। আত্মসম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, উদার ও কল্যাণ বুদ্ধি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতিবান জীবনযাত্রী তার চলার পথ দীপ্ত করে, পথের দু'ধারে দ্যুতি ছড়িয়ে অপরকে দিশা দিয়ে, অন্তরের মাধুরী বিলিয়ে জীবনের প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়, ধন্য করে অন্যদের। তাই সংস্কৃতিই জীবন যাত্রীর পাথেয়। কেননা সংস্কৃতিপরায়ণতার অন্য নাম গতিশীলতা। অতএব মৌলিক সংস্কৃতি মাত্রই সৃজনধর্মী ও গতিশীল। ক্রমোৎকর্ষ ও উন্নয়নই এর ধর্ম।"

মোতাহার হোসেন চৌধুরী তাঁর "সংস্কৃতি কথা" গ্রন্থে বলেন: "পরিবেষ্টনের সংগে প্রীতির যোগে যে চিত্তের সমৃদ্ধি তাতেই সংস্কৃতির উৎপত্তি। সুতরাং এখানে সেখানে এক আধটু রংয়ের পার্থক্য থাকলেও আসল জিনিসটা এক। পরিবেষ্টন: আঁধার, প্রেম: তৈল, চিত্ত: সলতে আর সমৃদ্ধি বা সংস্কৃতি: আলোক। অতএব কি নামীয় আঁধারে আলো জ্বললো, এ নিয়ে যারা তর্কে প্রবৃত্ত হন, তাদের তার্কিক বলা গেলেও প্রেমিক বলা যায় না, আলোর ক্ষুধা বা আলোর প্রীতি তাদের জীবনে বড় হয়ে উঠেনি বলে।"

তিনি মনে করেন: "সমাজ সাধারণভাবে মানুষকে সৃষ্টি করে, মানুষ আবার নিজেকে গড়ে তোলে শিক্ষাদীক্ষা ও সৌন্দর্য সাধনার সহায়তায়। এই যে নিজেকে বিশেষ ভাবে গড়ে তোলা এরি নাম কালচার। তাই কালচার্ড মানুষ স্বতন্ত্র সত্তা, আলাদা মানুষ। নিজের চিন্তা, নিজের ভাবনা, নিজের কল্পনার বিকাশ না ঘটলে কালচার্ড হওয়া যায় না।"

তিনি বলেন: সত্যকে ভালোবাসো, সৌন্দর্যকে ভালোবাসো, ভালাবাসাকে ভালোবাসো, বিনা লাভের আশায় ভালোবাসো, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালোবাসো – এরই নাম সংস্কৃতি।

অনেকে সংস্কার মুক্তিকেই সংস্কৃতি মনে করে, উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। কিন্তু তা সত্য নয়। সংস্কার মুক্তি সংস্কৃতির একটা শর্তমাত্র।

www.icsbook.info

তাও অনিবার্য শর্ত নয়। অনিবার্য শর্ত হচ্ছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ ছাড়া সংস্কার অসম্ভব। তাই শুধু সংস্কার মুক্তির ওপর আস্থা পালন করে থাকা যায় না, আরো কিছু দরকার। কামের চেয়ে বড় প্রেম, ভোগের চেয়ে উপভোগ, এ সংস্কার না জন্মালে সংস্কৃতি হয় না। সূক্ষ্ম জীবনের প্রতি টান সংস্কৃতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু মূল্যবোধহীন সংস্কার মুক্তির টান সে দিকে নয়, তা স্থূল জীবনেরই ভক্ত।

সংস্কৃতি মানেই অহমিকা মুক্তি। অহমিকার গুমোট ভরা অন্ধকারে সংস্কৃতিকামীর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। অহংকার পতনের মূল কিনা তা সে বলতে পারে না; তবে তা যে আনন্দের অন্তরায় সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন।"

তিনি মনে করেন: "অমৃতকে কামনা, তথা প্রেমকে কামনা, সৌন্দর্যকে কামনা, উচ্চতর জীবনকে কামনা, এই তো সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানে জীবনের Values সম্বন্ধে ধারণা।"

ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের ভার নিয়েছে কালচার। সংস্কৃতি মানেই আত্মনিয়ন্ত্রণ— নিজের আইনে নিজেকে বাঁধা। বন্দুকের নলেই যারা জীবনের একমাত্র সার্থকতা খুঁজে পান তারা কালচার্ড নন। কারণ তার মতে: "কালচার্ড লোকেরা সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন অন্যায় আর নিষ্ঠুরতাকে। কালচার সমাজতান্ত্রিক নয়, ব্যক্তিতান্ত্রিক। নিজেকে বাঁচাও, নিজেকে মহান করো, সুন্দর করো, বিচিত্র করো— এ-ই কালচারের আদেশ।

কালচার ব্যক্তিতান্ত্রিক একথা বললে এ বুঝায় না যে, কালচার্ড মানুষ সমাজের ধার ধারে না। সে দল ছাড়া, গোত্র ছাড়া জীব। তা নয়, সমাজের ধার সে খুবই ধারে। নইলে প্রাণ পাবে কোত্থেকে? কালচার্ড মানুষ সমাজের কথা ভাবে। এমনকি দরকার হলে সমাজের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। কিন্তু সবচেয়ে বেশী চায় সে নিজের জীবনে সোনা ফলাতে। কেননা সেখানে তার অবাধ অধিকার। তাই জগৎকে মেরামত করার চেয়ে নিজেকে শুধরানোর দিকেই তার অধিক ঝোঁক। সংক্ষেপে, সুন্দর করে, কবিতার মতো করে বলতে গেলে— সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা।"

আবুল ফজল বলেন: কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও ধার্মিকের সৃষ্টিকে হজম করেই সংস্কৃতিকে করা যায় আয়ত্ত্ব ও একমাত্র এভাবেই হওয়া যায় সংস্কৃতিবান। কতিপয়ের সৃষ্ট বিষয় যখন অনেকের উপভোগের ব্যাপার হয়, অতীত ও বর্তমানের উৎকৃষ্ট বস্তুগুলো যখন মানুষ সাগ্রহে গ্রহণ করে ও তার উপযুক্ত মূল্য দেয়, তখনই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের সাধনাই সংস্কৃতি। তার জন্য সম্মান, অবসর ও নিরাপত্তার যেমন দরকার, প্রীতি ও শ্রদ্ধার দরকার আরো বেশী। মনুষ্যত্ব তথা মানব ধর্মের সাধনাই সংস্কৃতি এবং একমাত্র এ সাধনাই জীবনকে করতে পারে সুন্দর ও সুস্থ। প্রচলিত অর্থে আমরা যাকে সংস্কৃতি বলে থাকি তারও লক্ষ্য

www.icsbook.info

মন আর চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন। মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য সাধনার ওপর, এক কথায় মনুষ্যত্বের ওপর যে সংস্কৃতির ভিত্তি, একমাত্র সে সংস্কৃতিই মানব জীবনে বিকিরণ করতে পারে আলো। যে আলোর নেই কোন দেশ, কোন কাল ও কোন জাত।"

ওয়াকিল আহমদ-এর ভাষায়: "জীবন ছাড়া সংস্কৃতি নেই। এ জীবন অচল, অবাক, অক্ষম হলে চলে না– সজীব, সবাক ও সক্ষম হওয়া আবশ্যক। প্রাণহীন জড়প্রকৃতির সংস্কৃতি নেই। মোট কথা সংস্কৃতি জীবন সম্পৃক্ত, বস্তুসংলগ্ন এবং মানসসম্ভূত।"

বদরুদ্দিন ওমরও প্রায় একই অভিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন: "জীবন চর্চারই অন্য নাম সংস্কৃতি। মানুষের জীবিকা, তার আহার-বিহার, চলাফেরা, তার শোক-তাপ, আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি, তার শিক্ষা-সাহিত্য, ভাষা, তার দিন রাত্রির হাজারো কাজকর্ম, সব কিছুর মধ্যেই তার সংস্কৃতির পরিচয়।"

গোপাল হালদার সংস্কৃতির স্বরূপ উল্লেখ করে বলেন: "সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মানুষের প্রায় সমুদয় বাস্তব ও মানসিক কীর্তি ও কর্ম, তার জীবন যাত্রার আর্থিক ও সামাজিকরূপ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া আর নানা শিল্প সৃষ্টি, সমস্ত চারু ও কারু কলা– এই হল সংস্কৃতির স্বরূপ।"

আবুল মনসুর আহমদ বলেন: "কোনও সমাজ বা জাতির মনে কোন এক ব্যাপারে একটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যবহার বিধি মোটামুটি সার্বজনীন চরিত্র, ক্যারেক্টর, আচরণ বা আখলাকের রূপ ধারণ করলেই সেটাকে ঐ ব্যাপারে ঐ মানবগোষ্ঠীর কালচার বলা হইয়া থাকে।"

পাশ্চাত্য মনীষীদের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি

কোন জাতির বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার বিশেষ গুণান্বিত আঙ্গিকের পরিশীলিত ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশকে সংস্কৃতি বলা হয়।

ডিউই বলেন: Culture means at least something cultivated, something repened. It is opposed to the raw and crude.

অর্থাৎ সংস্কৃতি বলতে বুঝায় এমন কিছু যার অনুশীলন করা হয়েছে, যা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ হচ্ছে অপরিণত ও অমার্জিতের পরিপন্থী।

টেইলর বলেন: Culture is the complex-whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by men as a member of society.

অর্থাৎ সংস্কৃতি হল সমাজস্থ মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কথা, নীতি-নিয়ম,

www.icsbook.info

সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতার জটিল সমাবেশ।

ডিউক বলেন: It is cultivated with respect to appreciation of ideas and art and breed human interest. অর্থাৎ এ হল ধারণা ও কলার মূল্য নির্ধারণ ও মানবীয় অনুরাগ জাগ্রত করার অনুশীলন।

ইউনেস্কো সম্মেলনে স্থিরীকৃত সংস্কৃতির সংজ্ঞা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক নীতিমালা চিহ্নিত করতে গিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইউনেস্কো কতকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৮২ সালে মেক্সিকো শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলো বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসাক্ষরিত হয়। এই সম্মেলন কর্তৃক সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় তা হলো : "ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং আবেগগত চিন্তা এবং কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যই একমাত্র সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বস্তু নয়, মানুষের জীবনধারাও সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অঙ্গ।"

"সংস্কৃতি মানুষকে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার অধিকার এবং ক্ষমতা প্রদান করে। আমরা যে বিশেষভাবে যুক্তিবাদী মানুষ, যে মানুষের বিচার-বুদ্ধি আছে এবং ন্যায়ের প্রতি আনুগত্য আছে তা আমরা অনুভব করতে পারি সংস্কৃতির মাধ্যমে। সংস্কৃতির মাধ্যমেই আমরা মূল্য নিরূপণ করি এবং ভাল-মন্দের মধ্যে নির্বাচন করতে শিখি। সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে, আত্মসচেতন হয়। নিজের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বোধ জন্মে, নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বোধ জন্মে। নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শেখে। অনবরত নিজের সীমা অতিক্রম করে দক্ষতা অর্জন করে।"

বাংলাদেশ জাতীয় সংস্কৃতি কমিশনের মতে সংস্কৃতি

সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ অত্যন্ত জটিল। সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প, নীতিবোধ, আইনকানুন, প্রথা এবং আরো বহুবিধ বিষয়, যার সাহায্যে মানুষ একটি সমাজ এবং একটি জাতির সদস্য হয়। মানুষের কর্মসাধনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির স্বভাব নিহিত থাকে, মানুষের উচ্চারণের মধ্যে সংস্কৃতির স্বভাব নিহিত থাকে এবং মানুষের আদর্শের মধ্যে সংস্কৃতির প্রজ্ঞা বহমান থাকে। প্রতিদিন মানুষ যে জীবন-যাপন করছে সে জীবন-যাপনের কর্মপ্রবাহই সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক।

www.icsbook.info

এভাবে মানুষের ক্ষমতা এবং অক্ষমতার প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির রূপরেখা চিহ্নিত হয়। মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করে। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক একটি জীবন আছে, সংসারের একটি প্রেক্ষাপট আছে। সংসার, সমাজ, জাতি এবং দেশের একটি পরিচয় নিয়ে মানব সংস্কৃতির উদ্ভব এবং বিকাশ।"

পারিভাষিক অর্থে সংস্কৃতি

"সংস্কৃতি" শব্দটি সংস্করণ বা সংস্কার বিশেষ্য পদ থেকে গঠিত। 'সংস্করণ' অর্থ বিশোধন, সংশোধন। 'সংস্কার' অর্থ শুদ্ধিকরণ, শাস্ত্রীয় নীতিমালা ও অনুষ্ঠানাদি দ্বারা পবিত্রকরণ, শোধনকরণ বা পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধারকরণ, পরিষ্কার বা নির্মলকরণ, অলংকরণ, প্রসাধন, উৎকর্ষ সাধন, উন্নতি বিধান, মেরামতকরণ। অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, রীতিনীতি ও মার্জিত আচার-আচরণ ইত্যাদির উৎকর্ষ হচ্ছে কৃষ্টি বা Culture এর বিশেষণ। 'সংস্কৃত' শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন বস্তু বা বিষয় যা সংস্কার করা হয়েছে, শ্রীমণ্ডিত, সজ্জিত ও অলংকৃত করা হয়েছে। কৃষ্টিও সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কর্ষণ (অর্থ ঘর্ষণ) থেকে-এর উৎপত্তি। 'অনুশীলন'ও এর এক অর্থ।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় সংস্কৃতি শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর শাব্দিক অর্থের প্রতি তাকালেও সংস্কৃতির উল্লেখিত সংজ্ঞায় বিবৃত ভাবেরই প্রতিনিধিত্ব ও পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন:

১। Culture (কালচার) অর্থ– কর্ষণ করা, চাষ করা। অনুপযুক্ত জমিকে যেমন কর্ষণ ও চাষের দ্বারা মসৃণ ও ফসলোৎপাদনের উপযোগী করা হয়, তেমনি সদাচরণের কর্ষণ ও চাষের অনুশীলন, পরিশীলিতকরণের দ্বারা একটি ব্যক্তি বা জাতির আচার-আচরণ অপরের চিত্তের কাছে গ্রহণ বা উপভোগের উপযোগী হয়। তার সদাচরণমণ্ডিত ক্রিয়াকর্ম হয় তখন অপরের কাছে প্রশংসিত ও তার পরিচয় নির্দেশক। এ কারণেই চাষকৃত উপযুক্ত জমিকে যেমন Cultured land বলা হয়, তেমনি মানুষের উপযুক্ত, সুন্দর, মার্জিত ও পরিশীলিত আচার-আচরণের জন্য তাকে বলা হয় Cultured man or cultured nation.

২। আরবী 'সাকাফাহ্' অর্থ– সফল হওয়া, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাওয়া। শিক্ষার মাধ্যমেই সফলতা আসে। কোন ব্যক্তি-মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও কর্মানুষ্ঠান যখন অপরের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ধরা দেয়, ঐ মানুষটিকে তখন আরবী সমাজে বলা হয় (মুসাক্কাক) অর্থাৎ সংস্কৃতিবান, শিক্ষিত।

www.icsbook.info

৩। উর্দূ 'তমদ্দুন' শব্দটি 'মদীনা', 'মুদান' বা 'নগর', 'শহর' থেকে গঠিত। নগরজীবন ও শহরজীবনের ধারা ও চিন্তা-চেতনা যেহেতু গ্রামীণ জীবনধারা ও চিন্তা-চেতনার তুলনায় অনেক দিক থেকে পরিশীলিত ও মার্জিত হয়ে থাকে, তাই নগর-সভ্যতা, নগর-কৃষ্টি ও আচার-আচরণ আশ্রিত জীবনাচার তমদ্দুন কিংবা তাহযীব-তমদ্দুন রূপে খ্যাত।

তাহযীব শব্দের অর্থ হচ্ছে সজ্জিতকরণ। যে ব্যক্তি বা সমষ্টি আপন চিন্তা চেতনা ও জীবনধারার মধ্য দিয়ে নিজেকে সজ্জিত, নন্দিত, পরিশীলিত ও সমাদৃত করে উপস্থাপন করতে পারে তাকে বলা হয় সংস্কৃতিবান ও সভ্য।

সৃষ্টির সেরা মানুষ। তার এই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা বজায় রাখা ও এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে তার প্রয়োজন সংস্কৃতির। সংস্কৃতি মানুষেরই আছে– অন্য জীবের সংস্কৃতি বলে কিছুই নেই। মানুষ হিসেবে মানুষের আসল পরিচয়ই তার সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণা

শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়কে সাধারণত সংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও আসলে এইগুলো ঠিক সংস্কৃতি নয়; বরং সংস্কৃতির বাহন মাত্র। মানব মনের অন্তর্নিহিত শক্তি, কৌতূহল ও প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লাভ করে সংস্কৃতির মাধ্যমে। সংস্কৃতিকে শুধু কিছু রীতিনীতি কিংবা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। কিংবা শুধু চিন্তা-চেতনা, কল্পনা ও ধ্যানের মধ্যেও আবদ্ধ রাখা যায় না। আবার ঘর, বাড়ি-গাড়ী এবং ধন-দৌলতের মধ্য দিয়েও সংস্কৃতির পরিচয় ফুটে উঠে না। সংস্কৃতি সমাজ দেহের শুধু লাবণ্য ছটা নয়, তার সমগ্ররূপ। এ জন্যই সংস্কৃতির মাধ্যমে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে। খণ্ড খণ্ড কিংবা আংশিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কখনও মানুষকে তার মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করতে পারে না।

অপসংস্কৃতি

"অপসংস্কৃতি" কাকে বলে এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দেয়া বড় কঠিন। যা একটি জাতির সাংস্কৃতিক স্বভাবের বিপরীত বা সাংস্কৃতিক আদর্শ-বিরুদ্ধে অথবা যা কল্যাণকে পরাঙ্মুখ করে বা বিধ্বস্ত করে তাই অপসংস্কৃতি। জাপানে 'অন' বলে একটি কথা আছে। 'অন' শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্বভাব বা প্রকৃতি বা এক প্রকারের নিজস্বতা। এই 'অন'-এ যখন আঘাত লাগে বা 'অন' থেকে বিচ্যুতি ঘটে তখনই এক ধরণের বিপর্যস্ততা আসে, তাকেই জাপানীরা অপসংস্কৃতি বলে। অর্থাৎ একজন মানুষ বা একটি পরিবার বা একটি গোত্র বা একটি জাতি যতদিন নিজস্ব ভাবে

www.icsbook.info

বিদ্যমান থাকে ততদিন কোনো সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু যে মুহূর্তে তার আপন প্রকৃতি থেকে বিচ্যুতি ঘটে বা আপন স্বভাব থেকে বিচ্যুতি ঘটে সে মুহূর্তে নতুন প্রবৃত্তি জন্ম নেয় এবং পুরাতন স্বভাবকে বিশৃংখল করে দেয়। এই অবস্থাটা আমরা কাম্য মনে করিনা। তবে মনে রাখতে হবে যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে একটি সমাজে, বিশ্বাসে বা ধারনায় পরিবর্তন আসতে পারে। সে পরিবর্তনটি কল্যাণবহ হতে পারে এবং এই কল্যাণবহ পরিবর্তনটি মানুষে এবং সমাজে একটি নতুন প্রকৃতির জন্ম দিতে পারে। সে প্রকৃতি খারাপ নাও হতে পারে। অর্থাৎ পরিবর্তনটাই অপসংস্কৃতি নয়, অপসংস্কৃতি হচ্ছে এক ধরনের বিরূপতা বা মন্দ ভাব, যার কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধি নেই।

আমাদের জীবনে ভালো এবং মন্দ উভয়েরই একটি মানদণ্ড থাকে। একটি জাতিসত্তার অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের সাহায্যে এ মানদণ্ড তৈরী হয়। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সমস্ত চিন্তাধারা কার্যকরভাবে প্রবাহিত ছিল তার সাহায্যে আমাদের সমাজ জীবনে এবং ব্যক্তিগত জীবনেও কিছু নীতিবোধের জন্ম হয়েছে। সেই নীতির সাহায্যে আমরা সত্য মিথ্যা নিরূপণ করি, কল্যাণ অকল্যাণকে চিহ্নিত করি এবং সাম্য অসাম্যকে বিশ্লেষণ করি। সুতরাং অপসংস্কৃতি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে একটি জাতি বা দেশের ঐতিহ্যকে বিবেচনার আয়ত্তে আনতেই হবে।

বিত্তবান এবং দরিদ্রের তারতম্যের কারণেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতি শব্দটি যুক্ত হয়েছে। যারা বিত্তবান তারা এমন কিছু আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করছে যা একমাত্র অর্থের সাহায্যে ক্রয় করা যায় অথবা নির্মাণ করা যায়। যেমন চিত্তবিনোদনের জন্য বিশেষ ধরনের নৃত্যগীতের আসর অথবা কুরুচিপূর্ণ ভিসিআর প্রদর্শনী। এছাড়া বিশেষভাবে আয়োজিত বিদেশী উৎসব এবং আনন্দ আমাদের সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার বিত্তহীন সমাজ থেকে অন্য ধরনের অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে। অশিক্ষা এবং বেকারত্বের কারণে এখানকার যুব সম্প্রদায় আশংকাজনকভাবে অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। মাদকদ্রব্য সেবন বহু কর্মহীন যুবকদের বিনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা আমাদের বর্তমান সমাজে অপসংস্কৃতি বলে যাকে চিহ্নিত করতে পারি তা মোটামুটি নিম্নরূপে উল্লেখ করতে পারি:

১. বিদেশী প্রাচুর্য থেকে সৃষ্ট এক ধরনের নৃত্যগীত, যা আমাদের যুব সম্প্রদায়কে ভ্রান্তি ও উদ্দামতার পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য নৃত্য আমাদের দেশে গৃহীত হয়নি। এবং তাদের 'ব্যালে' নৃত্য আমাদের সমাজে প্রচলন পায়নি। ব্যালে নৃত্যটি কাহিনী নির্ভর এবং নৃত্যের ভঙ্গিটি এক ধরনের শরীরী ব্যঞ্জনা।

www.icsbook.info

মাধ্যমে পৃথিবীতে তার উপস্থিতিকে সুচিহ্নিত করে।

২. সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের মাধ্যমে একটি জাতি তার স্বাধীনবোধকে প্রমাণিত করে, অপরপক্ষে বিরোধী সংস্কৃতির আগ্রাসন জাতিসত্তার অভিজ্ঞানকে ধ্বংস করে।

৩. সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার অতীতকে আবিষ্কার করে, অতীতের প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হয় এবং বাইরের পৃথিবীর কাছ থেকে কল্যাণপ্রদ বস্তু গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়। একটি জাতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকেই শুভ ও কল্যাণকে গ্রহণ করে সৃষ্টিধর্মিতার মধ্যে অগ্রসর হতে পারে।

৪. পৃথিবীর সকল প্রকার সংস্কৃতিই মানবজাতির ঐতিহ্য। একটি জাতির সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান বলিষ্ঠ ও তাৎপর্যবহ হয় বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে। সংস্কৃতি এক প্রকার সংলাপের মত। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি সমৃদ্ধমান হয়, বিনিময় না থাকলে যে কোন সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৫. কোন একটি একক সংস্কৃতি তার সার্বজনীনতা স্বীকৃত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়তেই হবে এবং এ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে সে তার নিজের অস্তিত্ব প্রমাণিত করবে। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

৬. বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না, বরঞ্চ আদান প্রদান সহজ ও সুন্দর হয়। সংস্কৃতির বহুবচনতা যাকে আমরা ইংরেজীতে বলি 'প্লুবালিসম' বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করেই তৈরী হয়ে থাকে।

৭. মানুষের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতিকে সম্মান করা ও সংরক্ষণ করা।

৮. একটি জাতির সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং অভিজ্ঞান সংস্কৃতির দ্বারাই চিহ্নিত হয়। মনে রাখতে হবে সংস্কৃতির মাধ্যমে আত্মিক, মানসিক এবং পার্থিব ইচ্ছার বিকাশ ঘটে থাকে। যথার্থ উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষের কল্যাণ। মনে রাখতে হবে সকল উন্নয়নের মূলে রয়েছে মানুষ। সুতরাং কোন দেশের জন্য সাংস্কৃতিক নীতি-নির্ধারণ করতে গেলে সে দেশের মানুষের আশা-আকাংখাকে এবং জীবনযাপনের ব্যবস্থাকে সম্মান করতে হবে।

৯. সংস্কৃতি জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয় এবং জনগোষ্ঠীর কাছেই প্রত্যাবর্তন করে। সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা, অধিকার, সকল শ্রেণীর মানুষই পাবে, কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ নয়। সুতরাং সকল মানুষ যাতে সংস্কৃতির সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে সে কারণে সকলের জন্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করতে হবে

www.icsbook.info

আমাদের দেশে এই নৃত্যের ক্ষেত্র এখনো প্রস্তুত হয়নি। এমনকি আমাদের নৃত্যনাট্যের প্রয়োজনেও ব্যালে নৃত্যের আঙ্গিকেরও কোন রূপান্তর হয়নি। অন্যদিকে 'ব্যালে' নৃত্য হোটেলে ক্লাবে অথবা আধুনিক ধনীদের গৃহে প্রবেশ করলেও দেশের সংস্কৃতির অঙ্গনে তা সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। তাই এগুলোকে একপ্রকার অপসংস্কৃতি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

২. দেশের জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কহীন এক ধরনের সিনেমা সৃষ্টি, যে সিনেমা জাতীয় জীবনের ভাবাদর্শকে অবলম্বন না করে বিদেশী উদ্দামতার আসক্তিকে পরিদৃশ্যমান করে।

৩. উপযুক্ত পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণহীন ব্যক্তিদের দ্বারা পাশ্চাত্যের পপের অনুকৃত সঙ্গীতের প্রচলন যা আমাদের দেশে চৈতন্যের ধারায় অবাস্তব এবং অপ্রাকৃত।

৪. বেকার যুবক এবং উদ্দেশ্যহীন তরুণ সম্প্রদায়ের মাদকাশক্তি।

৫. অশিষ্ট পোশাক পরিচ্ছদের প্রচলন, যা জাতি হিসেবে আমাদের সম্ভ্রম রক্ষা করেনা।

৬. আধুনিকতার উৎকর্ষের বদলে আধুনিকতার নামে নীতিহীনতার প্রশ্রয়ের ফলে সমাজে চরিত্রহীনতার প্রতিষ্ঠা।

৭. বিত্তবান এবং বিত্তহীনদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান সৃষ্টির ফলে একটি দ্বন্দ্বময় অবস্থার সৃষ্টি যা দেশকে ক্রমশ: প্রহেলিকা এবং অসদ্ভাবের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

৮. মদ্যপান আমাদের স্বভাব বিরোধী এবং আমাদের ধর্মের প্রবণতার দ্বারা নিষিদ্ধ। সেই কারণে মদ্যপান এদেশে এমন একটি আসক্তির জন্ম দিয়েছে যা অপসংস্কৃতির লালন ক্ষেত্র হয়েছে। এই মাদকাসক্তি বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ড্রাগের আসক্তিতে পরিণত হয়েছে। এটি বর্তমানে আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ড্রাগের আসক্তি জাতীয় জীবনে ভয়ংকর আঘাত স্বরূপ।

৯. আমাদের সামাজিক সমস্যার মধ্যে একটি বিশেষ সমস্যা হচ্ছে তরুণদের অপরাধ প্রবণতা। এই অপরাধ প্রবণতা অপসংস্কৃতি থেকেই জন্মলাভ করেছে।

বিভিন্ন দেশে সামাজিক কর্মকাণ্ডের গবেষকগণ অপরাধ প্রবণতার যে সমস্ত কারণ নির্ণয় করেছন তা নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যায়:

ক. শৈশবে পিতামাতা কর্তৃক মাত্রাতিরিক্ত আদর যত্ন বা উপযুক্ত আদর যত্নের অভাব।

খ. গৃহে গুরুতর শারীরিক দণ্ড প্রদান এবং অকারণ নিষ্ঠুর শাসন। মাতাতিরিক্ত সুবিধা প্রদান।

www.icsbook.info

গ. গৃহে ধর্মীয় ও নীতিশিক্ষার অভাব একটি নীতিবোধহীন জীবনধারা নির্মাণে সহায়তা করে। যার ফলে এমন একটি শৈশব গড়ে ওঠে যা শিশুদের ক্রমশ: অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়।

ঘ. সম্পদের আতিশয্য অথবা চরম দারিদ্র উভয় অবস্থাই বিকারের জন্ম দিতে পারে এবং আপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে।

ঙ. বিদেশী কমিক বই, টেলিভিশন এবং ছায়াছবির ভায়োলেন্সের চিত্র দর্শনজনিত কারণে অপরাধ প্রবণতা জন্ম লাভ করে।

ভিন্নদেশের সংস্কৃতির কোন দুর্বল দিক অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা অনুকৃত হয়ে ব্যবসায়িক বা অন্য বিকৃত উদ্দেশ্যে প্রচলনের প্রচেষ্টাকেই অপসংস্কৃতি বলা যেতে পারে। বিপরীতে বিদেশী সংস্কৃতির সেরা উপাদানগুলোকে আমরা সর্বমানবিক সাংস্কৃতিক উপকরণ বলে মনে করতে পারি।

আমাদের দেশে ধর্মের পবিত্র ও মহিমান্বিত রূপকে আঘাত করে নানাবিধ সমাজ সংস্কৃতি বিরোধী কার্যকলাপ অতীতে দেখা গেছে এবং বর্তমানেও তার নিদর্শন রয়েছে। যেমন, মসজিদে মাদত, মাজার উপাসনা এবং তৎসংক্রান্ত উৎসবাদির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইসলামের ধর্মীয় নীতিমালায় এগুলো কোনো ক্রমেই সমর্থিত নয়।

সমাজের নিয়মনীতি বহির্ভূত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের কালস্রোতে সমাজ প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে যা আমরা সাধারণভাবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অঙ্গীভূত করতে পারিনা। স্বভাবতই এগুলোকেও অপসংস্কৃতি রূপে গণ্য করতে হবে।[৭]

সাম্প্রতিক কালে সর্বাধিক মারাত্মক যে অপসংস্কৃতি আমাদের সমাজকে প্রচণ্ডভাবে গ্রাস করছে তা হলো বিদেশী মিডিয়া। সি এন এন, বি বি সি ছাড়াও ডিশ এন্টিনার বদৌলতে প্রাইম, স্টার টিভি, জিটিভি, এমটিভি এখন আমাদের ঘরে ঘরে। এসব টিভির মাধ্যমে যে সংস্কৃতি আমাদের ঘরে ঘরে বিস্তারিত হচ্ছে তার ফলে আমাদের দীর্ঘকালীন ঐতিহ্য, নীতিবোধ, ধর্মবোধ সবকিছুর ওপর এক প্রচণ্ড আঘাত নেমে এসেছে।

সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা রক্ষার আন্তর্জাতিক নীতিমালা

১৯৮২ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বা আইডেনটিটি রক্ষার জন্য একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণীত হয়। যার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে:

১. প্রত্যেক সংস্কৃতি জাতি-সত্তার ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে এবং কতকগুলো অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রত্যেক জাতি তার সংস্কৃতির

www.icsbook.info

এবং সকলকেই সমান সুযোগের অধিকার দিতে হবে।

১০. একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে যে সমস্ত বিষয় গণ্য হবে তা হচ্ছে শিল্পীদের শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনা, স্থপতিদের নির্মাণ কর্ম, সংগীত শিল্পীদের সংগীত, নৃত্য শিল্পীদের নৃত্য বাজনা, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার এবং অনুসন্ধান কর্ম, মানুষের ধর্মবোধ এবং সেই সমস্ত মূল্যবোধের সুকৃতি যা জীবনকে অর্থবহ করে। অধিগম্য এবং অনধিগম্য সকল কর্ম, মানুষের ভাবপ্রকাশের ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস, ঐতিহাসিক নিদর্শন, নৃতত্ত্ব, গ্রন্থাগার সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

১১. পৃথিবীতে বহু দেশে অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে বহু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির অপরিকল্পিত প্রয়োগের ফলে সংস্কৃতিতে আঘাত লেগেছে। আবার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঔপনিবেশিকতা, বৈদেশিক প্রভাব সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করে। সুতরাং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি দেশ তার স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে।

এই নীতিমালা আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনেস্কোর স্থিরীকৃত। সকল দেশের সকল জাতির সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে ধারণ করেই এই নীতিমালা তৈরী হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই উচিত এই নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা।

www.icsbook.info

অধ্যায়-৩

তুলনামূলক আলোচনা

সংস্কৃতির স্বরূপ

সংস্কৃতির বস্তুগত, বিশ্বাসগত এবং নন্দনগত তিনটি স্বরূপ বিদ্যমান। বস্তুগত সংস্কৃতি বলতে মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট উপকরণকেই বুঝানো হয়। বিশ্বাসগত ক্ষেত্রে ধর্মীয় আদর্শ কিংবা বিভিন্ন মতাদর্শকে বুঝানো হয়। আর নন্দনগত সংস্কৃতি হচ্ছে তাই, যা মানুষের মনে রসবোধের জন্ম দেয়। যেমন– শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি।

মানুষের সংস্কৃতির মূলে আছে তিনটি প্রচেষ্টা।

১. প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজ আয়ত্তে আনা ও বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসকে সহজে লাভ করা।
২. জীবনকে সুশৃংখল করার জন্য কতকগুলো রীতিনীতি গড়ে তোলা। কিভাবে বাঁচব, কেন বাঁচব, ভালভাবে বাঁচা বলতে কি বুঝায়– তার উত্তর পেয়ে জীবনকে সেভাবে পরিচালিত করা।
৩. জীবনের একঘেঁয়েমি মোচন করা; অবকাশ মুহূর্তকে আনন্দময় করে তোলা। প্রাত্যহিক জীবনে সৌন্দর্য আরোপ করা।

সংস্কৃতির বিভাজন এবং মূল প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে বর্ণিত এই কার্যগুলোই কিন্তু সংস্কৃতি নয়। যেমন আমরা খাবার খেয়ে থাকি। এখন এই খাবার ভাত-রুটি হতে পারে, আবার মাছ-গোশতও হতে পারে। এই খাবার খেয়েই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়; কিন্তু এই ভাত-রুটি বা মাছ-গোশত খাওয়াটাই সংস্কৃতি নয়। সংস্কৃতি হচ্ছে খাবারের পদ্ধতি। আমরা যে পদ্ধতিতে খাবার গ্রহণ করব, সে পদ্ধতিটাই হচ্ছে সংস্কৃতি। অর্থাৎ **সংস্কৃতি হচ্ছে জীবন পরিচালনার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার নাম।**

সংস্কৃতি ও জীবন দর্শন

সংস্কৃতির সাথে জীবন দর্শনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। জীবন দর্শনের ভিত্তিতেই মানুষের চিন্তা-চেতনা আবর্তিত হয় এবং তার ভাব ও ক্রিয়াকর্মের অভিব্যক্তি ঘটে। এই জাগতিক জীবন সম্পর্কে তার ধারণা এবং এখানে মানুষের দায়িত্ব ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই জীবন সম্পর্কিত তার এই বিশেষ ধারণা বদ্ধমূল হয়।

জীবনের ব্যাপারে মানুষের এই ধারণা এবং জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে সংস্কৃতির উপাদান। জীবনের সকল কর্মতৎপরতা এবং কি কি কাজে তাকে তৎপর হওয়া

www.icsbook.info

উচিৎ, এসব কিছুর ভিত্তিতে তার জীবনের গতিধারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের কর্মক্ষমতা তার চিন্তাশক্তিরই অধীন থাকে। তার মনের ভাবানুভূতিই তার হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সক্রিয় করে তোলে। তাই যে কোন সংস্কৃতি মূলত: তার আকীদা-বিশ্বাসেরই ফল।

কোন সংস্কৃতির সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে এবং তার স্থায়িত্ব পরিমাপ করতে হলে দালানের স্থায়িত্বের পরীক্ষার ন্যায় যেমন তার ভিত্তি পরীক্ষা করতে হয়, তেমনি সেই সংস্কৃতিকে তার আকীদা-বিশ্বাসরূপ ভিত্তির আলোকেই মূল্যায়ন করতে হয়।

এখানেই আমাদের ফিরে তাকাতে হয় মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্যের দিকে। আগেই বলা হয়েছে যে, সংস্কৃতি শুধু মানব জাতির জন্য। পশু সমাজের জন্য সংস্কৃতি নয় এবং সংস্কৃতি কোন খণ্ডিত বিষয়ও নয়। সংস্কৃতি মানুষের জীবনের রূপ-কাঠামোকে তুলে ধরে, যার দ্বারা মানুষ তার নিজের পরিবেশ উন্নতকরণ ও সুন্দর ভবিষ্যত রচনায় সক্ষম হয়।

আসলে সংস্কৃতির এই বাহ্যিক রূপকাঠামোটাই কিন্তু সবকিছু নয়। জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য এটা একটা কর্মপদ্ধতি মাত্র। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, মানুষের জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্যের উৎকর্ষ বা কর্ষণ করাই সংস্কৃতির কাজ। এভাবেই একটি জীবন পূর্ণতা বা সফলতা লাভ করে।

জীবনের এই পূর্ণতা লাভের জন্য অর্থাৎ একটি সুস্থ, সুন্দর সৎ ও পরিচ্ছন্ন জীবন গড়ে তোলার জন্যই প্রয়োজন জীবন-বোধ বা দর্শন। আবুল ফজল বলেন: "জীবনবোধ ছাড়া সব রকম সংস্কৃতি সাধনাই ব্যর্থ। শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বড় কথা নয়, বড় কথা সুশিক্ষা, সুসভ্যতা ও সুসংস্কৃতি। ব্যক্তি নয়, জাতি নয়– জীবন। এই জীবন সাধকই হতে পারেন প্রকৃত সংস্কৃতিবান বা কালচার্ড।"

এই জীবন দর্শন, বোধ বা জীবন বিধানের ভিত্তিতেই মানুষ তার জীবনকে পরিচালিত ও অতিবাহিত করে। যদি এই বোধ বা দর্শন হয় নির্ভূল তবে তার জীবন হবে সুন্দর, সে হবে প্রকৃত সংস্কৃতিবান। যদি দর্শন হয় ভ্রান্ত তবে জীবন হবে বিপর্যস্ত আর সে হবে অপসংস্কৃতিতে নিমজ্জিত।

অতএব গোড়াতেই জীবনদর্শন বা জীবনবিধান ঠিক করে নেয়া প্রয়োজন। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, কোন জিনিস ব্যবহারের ব্যাপারে তার স্রষ্টা যে পদ্ধতি নির্দেশ করেন, সেই জিনিস ব্যবহারের সেটাই সর্বোত্তম ও নির্ভুল পন্থা। এ জন্যই মানব রচিত কোন জীবনাদর্শ দিয়ে শুদ্ধ সংস্কৃতির সন্ধান লাভ সম্ভব নয়। শুদ্ধ সংস্কৃতি পেতে হলে আমাদের যেতে হবে খোদায়ী দর্শনের কাছে। যেতে হবে তাঁর দর্শনের কাছে– যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, জীবন দিয়েছেন, আহার যোগাচ্ছেন এবং একদিন তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

www.icsbook.info

সংস্কৃতি ও আদর্শগত বিশ্বাস

জীবনধারণের জন্য নানা উপকরণ কিভাবে ব্যবহার করা হবে, তা নির্ভর করে ব্যক্তির ধর্মীয় বা আদর্শগত বিশ্বাসের ওপর। অর্থাৎ মানুষের জীবনের কর্মপদ্ধতি কি হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে তার আদর্শিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এক কথায় বলা যায়, সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হল বিশ্বাস। বিশ্বাসই মানুষের মনের উৎকর্ষ বা কর্ষণ করে থাকে, যার মাধ্যমে মানুষ তার মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। আর এই মানবীয় গুণাবলীর বিকাশের পর্যায়টাকে আখ্যায়িত করা হয় সংস্কৃতির নামে। সংস্কৃতির পরিভ্রমণ তাই বিশ্বাস-এর আবর্ত-রেখা বরাবরে। 'বিশ্বাস'-এর দৃঢ়তাই সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে।

যারা বিশ্বাসী তাদের ব্যক্তি জীবন এবং সামাজিক জীবন ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশ্বাস হচ্ছে একটি চিরন্তন উপলব্ধি– এর অবক্ষয় নেই, পরিবর্তন নেই। বিশ্বাসের বলেই মানুষ চরিত্রবান হয় এবং আদর্শবাদী হয়। এই বিশ্বাসী ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে।

সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বাসের একটি কার্যকর ভূমিকা আছে। তবে বিশ্বাসের মধ্যেও তারতম্য রয়েছে। একেশ্বরবাদীদের বিশ্বাস এক রকম, আর বহু দেবতার আরাধনা যারা করেন তাদের বিশ্বাস অন্য রকম। কোন কোন ধর্মে ঈশ্বরকে মানবরূপে আবির্ভুত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন খ্রীষ্টানরা যীশুখৃষ্ট বা হযরত ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে থাকেন এবং তাদের সকল ধর্মীয় প্রার্থনা যীশুর প্রতি নিবেদিত, আল্লাহর প্রতি নয়।

হিন্দুরা আবার বহুবিধ দেব-দেবীদের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। আবার বৌদ্ধরা কোন প্রকার বিশ্বাসের কথা বলেন না। তাঁরা বলেন যে, মানুষ তাদের কর্মের মাধ্যমে নির্বাণের পথে অগ্রসর হয় এবং নির্বাণ লাভের জন্যই তারা সদা-সর্বদা সতর্ক থাকবেন। এ নির্বাণ লাভের উপায় হচ্ছে পঞ্চশীল পালন করা এবং মানব হিতৈষণীয়রূপে নিজেদের নিযুক্ত রাখা।

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের এ পার্থক্য তাদের জীবনাচরণ এবং সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাদের খাদ্য গ্রহণে, আচার-আচরণে এবং পরিচ্ছন্নতা-অপরিচ্ছন্নতা জ্ঞানের মধ্য দিয়ে তাদের সংস্কৃতির পার্থক্য প্রকাশিত হয়। প্রকাশ্য ধর্মীয় আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির জীবন দর্শনের প্রকাশ ঘটে। হিন্দুদের দোল উৎসব, দূর্গা পূজা, কালী পূজা ইত্যাদি, খ্রীষ্টানদের বড়দিন উৎসব এবং মুসলমানদের ঈদ এবং মহররম উৎসব এক স্বভাবের এবং প্রকৃতির নয়। এ উৎসবগুলো সংস্কৃতির তাৎপর্যকে প্রকাশ করে। জীবন দর্শন তথা বিশ্বাসের এ পার্থক্যই মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিক বিভাজন সূচিত করে।

www.icsbook.info

সংস্কৃতি ও ধর্ম

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১৯৮২ সালের সম্মেলনের একুশ সংখ্যক প্রস্তাবে বলা হয় যে, যুবকদের চরিত্র এবং মানসিকতা গঠনের জন্য ধর্ম এবং আত্মিক আদর্শ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর সকল দেশেই এই গুরুত্ব অল্প বিস্তর তারতম্যসহ বিদ্যমান। সেই কারণে ইউনেস্কো মনে করে যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চৈতন্যের মূলে ধর্মের প্রভাব আছে। সুতরাং পৃথিবীর সকল দেশের কর্তব্য হচ্ছে ধর্ম ও আত্মিক চৈতন্যকে যথার্থ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা নির্ধারণের সময় ধর্মের স্থান সম্পর্কে সচেতনভাবে চিন্তা করা। সুতরাং এক্ষেত্রে ইউনেস্কোর প্রস্তাব হচ্ছে:

১. একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সে দেশের ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা।
২. সামাজিক এবং অর্থনেতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আত্মিক চৈতন্যকে পূর্ণ মর্যাদা প্রদান।
৩. ধর্মের একটি আন্তর্জাতিক বিশিষ্টার্থক এবং সর্বমানববাদী রূপ আছে। সেই রূপকে সংরক্ষণ করা এবং তার সঙ্গে সংস্কৃতিকে সমন্বিত করা।
৪. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিতে যে আত্মিক মূল্যবোধ বা স্পিরিচ্যুয়াল ভ্যালুজ রয়েছে আপনাপন সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে সে মূল্যবোধকে মর্যাদা দেয়া।

ইউনেস্কোর এ সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, জনসাধারণের কাছে ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কৃতির অঙ্গনে একটি জীবন্ত শক্তিরূপে সক্রিয়। বাংলাদেশেও প্রধানত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং প্রেরণা সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টান সকলের ক্ষেত্রেই ধর্মবিশ্বাসটি জীবনের প্রেরণার উৎস। এদেশের বিভিন্ন উৎসবের উৎস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সেগুলোর প্রায় সব কটিই ধর্মভিত্তিক। ধর্মভিত্তিক হয়েও সকল উৎসব আয়োজনের মধ্যে একটি উদারতা, সহনশীলতা এবং সকল শ্রেণীর মানুষকে এক সঙ্গে গ্রহণ করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ধর্ম হচ্ছে সংস্কৃতির একটি প্রধান উপাদান। ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। ইসলাম ধর্মের মূল বিশ্বাস হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বে শ্রদ্ধাবনত বিশ্বাস। হিন্দুরা বহু দেবদেবীবাদী কিন্তু তারাও এক পরম পিতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এই অর্থে যে, দেবদেবীদের মাধ্যমে সেই পরম পুরুষের আস্বাদন লাভ করা যায়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ধর্ম এখানে কেবলমাত্র ধর্মীয় রীতিনীতি এবং অনুশাসনই নিয়ন্ত্রণ করেনি বরঞ্চ মানুষের

www.icsbook.info

সামগ্রিক জীবনধারাকেও প্রভাবিত করেছে। এছাড়া প্রাত্যহিক জীবনেও কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মের অনুশাসন কার্যকর ব্যবস্থা হিসাবে বিদ্যমান থাকে। এদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনে ধর্ম একটি বিশেষ শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ধর্মের সাহায্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন এবং ঐক সম্ভব হয়েছে। মানুষের জীবন যাপন এবং সামাজিক কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ধর্ম এদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

এ অঞ্চলের ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রেও ধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। পালি ভাষা, সংস্কৃত ভাষা এবং আরবী ভাষা বাংলা ভাষাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। বৌদ্ধ, হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের ব্যাপক বিস্তারের ফলে এ অঞ্চলের ধর্মীয় ভাষাগুলো গুরুত্ব পেয়েছিল। এদেশের কৃষিকর্মের মধ্যেও ধর্মীয় আচার প্রবেশ করেছে। যেমন, শস্য রোপণ বা ফসল কাটার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন এদেশে আছে। খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধেও এদেশে ধর্মের কারণে বিভিন্ন রীতি ও প্রথা প্রচলিত হয়েছে। এভাবে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবো যে, আমাদের জীবনের সকল খুঁটিনাটি বিষয়েও ধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে। আর তাই পণ্ডিতগণ মনে করেন, যিনি ধার্মিক তিনিই সংস্কৃতিবান।

মোতাহার হোসেন চৌধুরী বলেন: "ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা, সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি। সাধারণ লোকেরা ধর্মের মারফতেই তা পেয়ে থাকে। তাই তাদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা আর কালচার থেকে বঞ্চিত করা এক কথা।"

ওয়াকিল আহমদ-এর মতে: "ধর্ম জাতীয় চরিত্র গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ধর্ম মানবজীবনের একটি অবিভাজ্য অপরিত্যাজ্য বিষয়। ধর্মীয় বিধান ও শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী এক জাতির যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি গড়ে উঠেছে। সুতরাং আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব বেশী।"

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রায় বালক বয়সেই লিখেছিলেন:

"চাষ কর দেহ জমিতে হবে নানা ফসল এতে
নামাজে জমি উগালে রোজাতে জমি ফসালে
কলেমায় জমিতে মই দিলে চিন্তা কিহে এ ভবেতে।।"

আবুল ফজল এই উদ্ধৃতি পেশ করে বলেন: " ধর্মীয় বিশ্বাস আর অনুষ্ঠানের দ্বারা মনের জমিতে ভাল করে চাষ দেয়া চাই।"

যিনি যত ভালভাবে এ চাষ দিতে পারবেন জীবনকে তিনি তত বেশী সুন্দর ও শোভন করতে পারবেন। অর্থাৎ প্রকৃত সংস্কৃতিবান হতে চাইলে তাকে ধার্মিক হতেই হবে। আর ধার্মিক হতে চাইলে তাকে হতে হবে সংস্কৃতিবান।

www.icsbook.info

অধ্যায়-৪

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার প্রেক্ষাপট

আধুনিক বিশ্বে ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে তাকে প্রধানত: তিনিটি ভাগে ভাগ করা যায়।
১. রাজনৈতিক। ২. কূটনৈতিক। ৩. সাংস্কৃতিক।

১. রাজনৈতিক পদক্ষেপ

সামরিক পদক্ষেপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকার নিপীড়ন ও দমনমূলক পদক্ষেপগুলো এর আওতায় পড়ে। এ ধরনের পদক্ষেপ হয় সরাসরি এবং প্রত্যক্ষ। সহজেই এ ধরনের পদক্ষেপ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষ এ ধরনের পদক্ষেপকে অমানবিক এবং মানবতা বিরোধী জ্ঞান করে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নিন্দা ও ধিক্কার জানায়। আর এ জন্যই ইসলাম বিরোধী শক্তি কখনো এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে প্রকাশ্যে না হলেও ভেতরে ভেতরে বেশ অস্বস্তিতে ভোগে। এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হতে থাকলে বিশ্ব জনমত ক্রমান্বয়ে তাদের প্রতিকূলে চলে যায়।

সাধারণত: কোন মুসলিম রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পেলে তারা এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী শক্তি বৃদ্ধি পেলেও এ ধরনের পদক্ষেপের আশ্রয় নেয় তারা। আবার মুসলিম রাষ্ট্রে যদি তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত সরকার থাকে তবে ইসলামী শক্তি দমনে তারা এ ধরনের পদক্ষেপ নেয় সে সরকারে মাধ্যমে।

এ ধরনের পদক্ষেপকে বিশ্বজনমত বিরূপ দৃষ্টিতে দেখে বুঝতে পেরে বাতিল শক্তি সামরিক ও দমনমূলক পদক্ষেপকে এখন তৃতীয় শ্রেণীর বিবেচনা করছে। তারা চেষ্টা করছে এ ধরনের পদক্ষেপকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলার। তবে বিশ্বব্যাপী তাদের প্রাধান্যকে অটুট রাখার স্বর্থে এ সামরিক ও দমনমূলক পদক্ষেপকে তারা কখনোই পুরোপুরি বাদ দিতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত: রাজনৈতিক হামলার আঘাতটা অত্যন্ত সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় বলে আক্রান্তদের মধ্যে দ্রুত এর প্রতিক্রিয়া হয়। মানুষ যখন বুঝতে পারে সে আক্রান্ত তখনই তার ভেতর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে প্রতিরোধ শক্তি। মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিষয়টি শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং আরো অনেক গভীর

www.icsbook.info

তাৎপর্যে পর্যবসিত হয়।

পৃথিবীতে মুসলমানরা সরাসরি ও প্রত্যক্ষ হামলার শিকার হয়ে এবং তার মোকাবেলায় নেমে সম্মুখ যুদ্ধে কখনো পরাজিত হয়নি। এমনকি বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, ধন ও জন বলের মোকাবেলায় তার চাইতে কম অস্ত্র ও কম জনবল নিয়েও মুসলমানরা বিশ্ব ইতিহাসে অনেকবার বিজয়ী হয়েছে। বাতিলের সাথে মুসলমানদের যে ক'টি যুদ্ধে বিভিন্ন সময় পরাজয় ঘটেছে, তা ঘটেছে মূলত: গাদ্দারদের চক্রান্তের ফলে। বাতিল শক্তি নয় বরং গাদ্দাররাই ছিল সে সব পরাজয়ের মূল কারণ। আর পরাজয় ঘটেছে সে সব ক্ষেত্রে যেখানে অসচেতন মুসলিম শক্তি মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

মুসলমানরা সরাসরি হামলার শিকার হলে তার ঈমানী চেতনা বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের ঈমান তখন এতটা মজবুতী অর্জন করে যে, তারা বাতিলের যে কোন হামলার মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। মুসলমানদের এ তীক্ষ্ণ ঈমানী চেতনার ফলে দুর্জয় শক্তির অধিকারী হওয়া কেবল ইতিহাসের বিষয় নয় বরং আমেরিকার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা সত্ত্বেও ইরানে ইসলামী শক্তির বিজয় এবং আফগানিস্তানে মুজাহিদদের হাতে অপর পরাশক্তি রাশিয়ার পরাজয় বিংশ শতাব্দীতেও এ সত্য আরেকবার সপ্রমাণিত করলো।

প্রত্যক্ষ সামরিক হামলা ও সরাসরি দমনমূলক পদক্ষেপের কারণে একদিকে বিশ্ব জনমত তাদের বিপক্ষে চলে যায় এবং অপর দিকে মুসলমানদের ঈমানী চেতনা বৃদ্ধি পায়– এ দুটি কারণ সুস্পষ্ট হওয়ায় বাতিল শক্তি মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে।

২. কূটনৈতিক পদক্ষেপ

কূটনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য বাতিল শক্তি উঠে পড়ে লেগেছে। ইতিমধ্যে মুসলমানদের ধ্বংস সাধনে এ পদক্ষেপ অত্যন্ত মোক্ষম ও কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। কূটনৈতিক পদক্ষেপের প্রথম টার্গেট বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও সংঘাত সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় টার্গেট মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ, অনৈক্য, কলহ এবং সংঘাত সৃষ্টি করা। মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ ও সংঘাত সৃষ্টির স্বার্থে তারা প্রধানত: পাঁচটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১) বিভিন্ন মাযহাবী ও ফেরকাগত পার্থক্যকে উস্কে দিয়ে মাযহাবী স্বাতন্ত্র্যের ফাটল বৃদ্ধি করা। ধর্মীয় উপদল সৃষ্টি করে মুসলিম মিল্লাতের সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তা থেকে মুসলমানদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখা এবং তাদেরকে খণ্ডিত ও ক্ষুদ্র

www.icsbook.info

স্বার্থের পিছনে লেলিয়ে দেয়া।

২) অবাধ গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল উপদল সৃষ্টি করা।

৩) এ দু'টি জাল ছিন্ন করে যারা বেরিয়ে যায় তাদের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্তার ঘটানো। এর ফলে অসংখ্য জাতিসত্তার উদ্ভব ঘটিয়ে মুসলমানরা যে এক ও অভিন্ন ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ এবং সকলেই মিল্লাতে ইসলামিয়ার অন্তর্ভুক্ত এ অনুভূতির বিস্তার রোধ করা।

৪) ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ নয় বা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তাকে মুসলিম সমাজে চালু করে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও চেতনা খর্ব করা এবং এভাবে সত্যিকার ইসলামী চেতনায় বিপর্যয় আনা।

৫) সত্যিকার ইসলামী চেতনার ধারক বাহক বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন সমূহকে মৌলবাদ আখ্যা দান এবং মৌলবাদীরা 'সন্ত্রাসী ও মানবতা বিরোধী' বলে প্রচারণার চালিয়ে সমাজে তাদের হেয় করা ও তাদের অগ্রযাত্রা রোধ করা।

এ সকল কূটনৈতিক পদক্ষেপর ফলে বাতিল প্রধানত: দু'ধরনের ফায়দা হাসিল করে।

১) মুসলিম শক্তিগুলো নিজেরাই পরস্পর হানাহানি করে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ঐক্যের সকল অনুভূতি বিনষ্ট হয়ে যায়। মহত্তর চিন্তা চেতনার পরিবর্তে ক্ষুদ্র ধ্যানধারণা ও স্বার্থের আবর্তে পরস্পর ঘুরপাক খেতে থাকে।

২) হানাহানিরত কোন কোন মুসলিম শক্তি বাতিলের কাছে আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করে। বাতিলের কাছ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য ও শক্তি তারা তাদেরই অপর ভাইদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। আর এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাতিল তার প্রভুত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করার কাজটি নির্বিঘ্নে সেরে নেয়।

বর্তমান বিশ্বে এভাবেই পরাশক্তিগুলো তাদের অস্ত্র বিক্রির প্রধান বাজার তৈরী করেছে মুসলিম বিশ্বে।

মুসলমানদের দাবিয়ে রাখার কূটনৈতিক এ কৌশল যথেষ্ট কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। বাতিল শক্তি বিবাদমান মুসলমানদের কোন একপক্ষের বন্ধু রূপে আবির্ভূত হয়। অনেক সময় তারা ইসলামের বন্ধু হবার ভান করতেও কসুর করে না।

বাতিল শক্তি কূটনীতির এ খেলা এতটা বিস্তৃত করে রেখেছে যে, অনেক সময় মুসলমানদের কোন কোন দল একথা বুঝতে পেরেও তার খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। আবার অনেক সময় মুসলমান বুঝতেও পারে না যে, বাতিলের প্ররোচনায় তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছে।

www.icsbook.info

কূটনীতির এ লড়াইয়ে বিজয়ী হতে হলে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও অনুশীলন যতটা প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, সে শিক্ষা ও অনুশীলনের যথেষ্ট অভাব মুসলমানদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে। উপরন্তু মুসলমানরা বাতিলের মত কূটনীতির এ লড়াইয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে না বলে সফলভাবে তার মোকাবেলা করা বেশ দুষ্কর। কূটনীতির এ লড়াইয়ে বাতিলের হামলা মোকাবেলা করার একটি মাত্র পথ আছে– আর তা হলো, মুসলমান জনসাধারণকে ইসলামের সঠিক আকিদা, বিশ্বাস ও কর্মে নিয়োজিত করা। ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ ও চর্চার মাধ্যমেই এ কাংখিত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।

৩. সাংস্কৃতিক পদক্ষেপ

বিশ্বব্যাপী বাতিল শক্তি মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে সবচেয়ে জোরালোভাবে যে কাজটি করছে তা হলো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এ এমন এক ভাইরাস যা এইডস-এর মত মারাত্মক এবং অতি দ্রুত তা সমগ্র সমাজ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে সমাজকে কলুষিত করে। স্বাস্থ্য সংক্রামক নয়– সংক্রামক হচ্ছে রোগ। এ জন্যই এ রোগ মুসলিম সমাজে দ্রুত সংক্রামিত হতে পারে। কোন মুসলমান এ হামলার শিকার হলে প্রথমে তার ঈমান দুর্বল হয়। ঈমান দুর্বল হলে আমল কমে যায়। কমতে কমতে এক সময় বন্ধ হয়ে যায় তার ইসলামী আমল। ফলে কখন যে মৃত্যু ঘটে তার মুসলমানিত্বের– সে কথা সে বুঝতেও পারে না।

এ সাংস্কৃতিক হামলা মুসলমানদের জন্য কতটা ক্ষতিকর– সাধারণ মুসলমান তো দূরের কথা, ইসলামী আন্দোলনের অনেক কর্মীর কাছেও তা সুস্পষ্ট নয়। যেহেতু এ হামলার আঘাতটা প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক নয় বরং অনেকটা অন্তর্প্লাবী তাই সহজে তা সবার নজরে পড়ে না। এ জন্যই ইসলামী আন্দোলনে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব কি এবং ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা না করলে তা মুসলমানদের জন্য কত ভয়াবহ বিপর্যয় ও ক্ষতি ডেকে আনতে পারে তা একটু বিশদভাবে আলোচনার দাবী রাখে। আমরা পর্যায়ক্রমে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব, বাতিলের সাংস্কৃতিক হামলার স্বরূপ সহ ইসলামী সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

www.icsbook.info

অধ্যায়-৫

ইসলামী সংস্কৃতি

আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় মানুষের জীবন প্রবাহের গতিধারা নিয়ন্ত্রণে সংস্কৃতির প্রভাব অপরিসীম। আধুনিকতার স্পর্শে উজ্জীবিত প্রতিটি মানুষের জীবনধারার মূল নিয়ন্ত্রক আজ সংস্কৃতি। তাই, সংস্কৃতি কি, এ পৃথিবীর একমাত্র প্রগতিশীল জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম 'প্রগতি ও আধুনিকতা'কে কিভাবে প্রভাবিত করে নিজেকে চির আধুনিক, চির সচেতন ও সচল হিসাবে প্রতিভাত করে আসছে সে বিষয়টি প্রথমেই জেনে নেয়া আবশ্যক। একই সাথে জেনে নেয়া আবশ্যক ইসলাম কি, ইসলামী সংস্কৃতি কি এবং আমাদের জীবন পরিচালনায় ইসলাম ও সংস্কৃতি কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে। জেনে নেয়া প্রয়োজন ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি ও মৌলিক নীতিমালাসমূহ।

ইসলাম কি এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়

আমরা জানি ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়– ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে যে, ইসলাম প্রতিটি যুগে, প্রতিটি কালে মানুষের মনে যত রকমের যুগ জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়েছে তার নির্ভুল সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছে। আজ পর্যন্ত এমন অবস্থা কখনোই সৃষ্টি হয়নি যে, মানুষের মনে কোন প্রশ্নের উদয় হয়েছে অথচ ইসলাম তার সমাধান বা জবাব দিতে অপারগতা বা অস্বীকার করেছে। পৃথিবীর কোন ধর্ম বা কোন মতবাদই মানবজীবনের সামগ্রিক এবং কালাতীত প্রশ্নাবলীর এমন উৎকৃষ্ট জবাব দিতে সমর্থ হয়নি। একদিন যে মতবাদটি উৎকৃষ্ট বিবেচিত হয়েছে কিছুকাল পরেই সে মতবাদটি অগ্রসরমান মানুষের চাহিদা পূরণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। পৃথিবীর সর্বশেষ জনপ্রিয় ভ্রান্ত মতবাদ সমাজতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে এ সত্যটি আরো একবার পৃথিবীব্যাপী মানুষের কাছে পরিস্ফুট হলো।

শুধু মুসলিম মনীষীরাই নয়– পৃথিবীর শত শত অমুসলিম মনীষীও এ সত্যটি দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেননি। আজো মুক্তবুদ্ধির মনীষীরা অকপটে তার স্বীকৃতি দিচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে জর্জ বার্নাড শ, গীবন, গ্যাটে, মর্মাডিউক পিকথল থেকে শুরু করে বহু মনীষীর কথা উল্লেখ করা যায়। ইসলাম শুধু যে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা তাই নয়– ইসলাম একধারে পরিপূর্ণ এবং কালাতীত জীবন ব্যবস্থা।

www.icsbook.info

ইসলাম এক কালাতীত জীবন ব্যবস্থা

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, ইসলাম এক পরিপূর্ণ ও কালাতীত জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম কালাতীত হতে পেরেছে এ জন্য যে, মানুষ মাত্রই যে সীমাবদ্ধতার শিকার অর্থাৎ মানুষ মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ, তেমন কোন মানুষ এটি সৃষ্টি করেনি।

দ্বিতীয়ত: মানুষ কোন বিশেষ সময়ের ও বিশেষ সমাজের প্রতিভু। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই সে স্বসমাজের এবং স্বসময়ের অনুরক্ত। এদিক থেকে বৃহত্তর অর্থে মানুষ অনিরপেক্ষ ও স্বার্থান্ধ। এ ধরনের সীমাবদ্ধ প্রজ্ঞা ও স্বার্থান্ধ মনোবৃত্তিধারী কোন মানুষের পক্ষে নিরপেক্ষ, সর্বজনগ্রাহ্য ও কালাতীত মতবাদ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এ ধরনের সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ কোন মানুষের তৈরী নয় ইসলাম। ফলে, ইসলামের পিছনে মানুষের স্বাভাবিক পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বা অজ্ঞতা প্রসূত সীমাবদ্ধতা কাজ করেনি। মানুষ এবং তামাম পৃথিবী ও পৃথিবীর অন্তর্গত তাবৎ বস্তুনিচয়ের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের কল্যাণের জন্য এবং তার সামগ্রিক সৃষ্টির কল্যাণের জন্য মানুষকে ইসলামের এ নেয়ামতে ভূষিত করেছেন। যেহেতু তিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং কিসে মানুষের কল্যাণ ও কিসে অকল্যাণ সে ব্যাপারে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল তাই তার দেয়া জীবনবিধানে কোন অপূর্ণতা বা ত্রুটির অবকাশ নেই। এ জন্যই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণ ও কালাতীত হতে পেরেছে।

ইসলামের চিরন্তনতা ও কালোত্তীর্ণতার নিয়ামক

ইসলাম তার চিরন্তনতা ও কালোত্তীর্ণতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে যে পদ্ধতির মাধ্যমে তার নাম ইজতিহাদ। ইজতিহাদ ইসলামের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যার কারণে ইসলাম পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, এক কাল থেকে আরেক কালে এবং এক দেশ থেকে আরেক দেশে কোন জটিলতা ছাড়াই অনায়াসে বিচরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ ইজতিহাদ যুগে যুগে মানুষের জীবনে উদ্ভুত সকল সমস্যার সমাধান দিতে সমর্থ হয়েছে।

ইসলাম কি চায়

ইসলাম মানুষের জন্য কি চায়? ইসলাম চায় মানুষের জীবনটা হোক সুন্দর, সমস্ত কল্যাণের অধিকারী হোক মানব সম্প্রদায়। এ কারণে মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম এমন কিছু সাধারণ ও শাশ্বত মূল্যমান (Values) নির্ধারণ করে দিয়েছে, যায় ব্যত্যয় ঘটলে মানব জীবনে জটিলতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে বাধ্য।

www.icsbook.info

আর এ শাশ্বত ও সাধারণ মূল্যমানগুলো এতই স্বতঃসিদ্ধ যে, স্থান ও কালের পার্থক্যের কারণে তাতে বিন্দুমাত্র হেরফের করার উপায় নেই।

আল্লাহতে অবিশ্বাস, আখেরাতে অবিশ্বাস, মিথ্যা, জুলুম, ব্যাভিচারসহ এমন কিছু কুকর্ম আছে যার কুফল সর্বকালে, সর্বদেশে বিপর্যয় ও অকল্যাণ ডেকে আনে। আবার স্রষ্টায় বিশ্বাস, পরকালীন ভয়, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা, সৃষ্টি প্রেম সহ এমন কিছু কল্যাণকর কাজ আছে যা সকল সমাজেই সুফলের আকর হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলাম চায় মানুষের সার্বিক কল্যাণ এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য। এ সাফল্য অর্জনের জন্যই ইসলাম মানুষের সামনে এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান পেশ করেছে। এ জীবন বিধান অনুসরণ করলে মানুষের জীবন কল্যাণ ও সফলতায় ভরে উঠবে আর এর থেকে বিচ্যুতি ঘটলে জীবনে নেমে আসবে অকল্যাণ, বিপর্যয় ও অসংগতি।

ইজতিহাদ ও অপরিবর্তনীয় বিষয়

ইসলামের শাশ্বত ও সাধারণ মূল্যমানগুলো ছাড়া মানুষের জীবনের বিস্তৃত পরিসরে মানুষকে অনেক রকম কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে হয়। ইসলামের এ শাশ্বত ও সাধারণ মূল্যমানগুলো অপরিবর্তনীয়। এ অপরিবর্তনীয় বিষয়ের বাইরে মানুষ যেসব কর্মকাণ্ডে জড়িত হয় সেসব কাজগুলোর ব্যাপারে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রয়েছে ইজতিহাদের ব্যবস্থা কোরআন ও সুন্নায় পারদর্শী মুজতাহিদগণ ইসলামের শাশ্বত বিধানের আলোকে সে সব বিষয়ে ইসলামের সিদ্ধান্ত কি হতে পারে তা তারা ব্যাখ্যা করেন।

এ সব বিষয়ে সময় ও পরিবেশের কারণে ব্যাখ্যায় পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মুজতাহিদগণ এমন ব্যাখ্যাও পেশ করতে পারেন, যা সর্বোতভাবে এক ও অভিন্ন নাও হতে পারে। এসব ব্যাখ্যার মধ্য থেকে সাধারণ মুসলমান যেটিকে অধিকতর কল্যাণকর মনে করবে তা অনুসরণ করার অধিকার ইসলাম মানুষকে দিয়েছে

দরুদ শরীফ দাঁড়িয়ে পড়তে হবে কি বসে পড়লে চলবে, টুপী গোল হবে কি কিস্তি হবে– এ ধরনের সমস্যায় মানবতার কল্যাণ বিঘ্নিত হয় না। তাই ইসলাম এগুলোকে ফরজ বা ওয়াজিব ঘোষণা করেনি। বস্তুত: ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল কাজের যে পরিমাণ গুরুত্ব ইসলাম দিয়েছে, হালাল-হারামের যে বিধান ইসলাম দিয়েছে তাকে যথাযথরূপে পালন করার মধ্যেই মানবতার কল্যাণ নিহিত। এভাবেই ইসলাম তার গ্রহণযোগ্যতার পরিধি বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর করেছে।

www.icsbook.info

ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বিষয়ের সীমা

মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সকল কাজে জড়িত হয় সে সব কাজ করার জন্য ইসলাম যে নীতিমালা দিয়েছে ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বিষয়সমূহ তার অন্তর্গত। জীবনের সামগ্রিক আচরণকে সামনে রেখে ইসলাম যে নীতিমালা দিয়েছে তাকে প্রধানত: তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে:

১) হালাল, ২) হারাম, ৩) মোবাহ। মানুষের জীবনের সকল কাজ বা আচরণ এর কোন না কোনটার আওতায় অবশ্যই পড়বে।

হালাল বা বৈধ বিষয়

যে সব কাজ ইসলাম অবশ্য পালনীয় করেছে বা যে সব কাজ করাকে ইসলাম পছন্দনীয় বলে স্বীকৃতি দিয়েছে সে সব কাজকেই হালাল বা বৈধ বলা যায়। এ হালালের আবার প্রকারভেদ আছে। হালাল কাজ বা আচরণগুলোকেও আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

এগুলো হচ্ছে:

১) ফরজ বা ওয়াজিব– যা অবশ্য পালনীয়। ২) সুন্নাত– যা পছন্দনীয়। ৩) নফল– যা বৈধ বা কল্যাণকর।

ফরজের আবার দুটো রূপ আছে। একটি হচ্ছে ফরজে আইন– যা সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ফরজে কেফায়া– যা অবস্থা ভেদে মানুষের ওপর অবশ্য পালনীয় হয়, সাধারণভাবে নয়।

সুন্নাতেরও আবার দুটো রূপ রয়েছে। একটি হচ্ছে সুন্নতে মোয়াক্কাদা– যা পছন্দনীয় শুধু নয় বরং বলা যায় অধিক পছন্দনীয়। দ্বিতীয় হচ্ছে সুন্নাতে যায়েদা– যাকে ইসলাম পছন্দনীয় বলে উল্লেখ করেছে।

ফরজ এবং ওয়াজিব কাজ ছাড়াও কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলোকে ইসলাম বৈধ এবং কল্যাণকর বলে উৎসাহিত করেছে। ফরজ ওয়াজিব পালন না করলে যেমন তাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয় এক্ষেত্রে তা করা হয় না। এসবই নফল।

হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়

যে সব কাজকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে এবং অপছন্দ করেছে তাকে হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ বা আচরণ বলা যায়। হারাম কাজেরও তিনটি পর্যায় আছে।

ক) হারাম– নিষিদ্ধ। খ) মাকরুহ তাহরিমি– চরম অপছন্দনীয়। গ) মাকরুহ তানজিহ– অপছন্দনীয়।

www.icsbook.info

মোবাহ্-এর বিষয়াবলী

যে সকল কাজের ক্ষেত্রে ইসলাম সরাসরি কোন নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞা কোনটাই প্রদান করেনি সে কাজগুলোই মোবাহ। এসব কাজে যেমন সওয়াবের ঘোষণা দেয়া হয়নি তেমনি এসব কাজ করলে পাপ হবে এ ভয়ও দেখানো হয়নি। হালাল বা হারাম-এর ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট এবং সীমিত। কিন্তু মোবাহ-এর ক্ষেত্র বিশাল ও অনির্দিষ্ট। জীবনের কর্মক্ষেত্রের বিশাল অঙ্গন জুড়ে এ মোবাহ-এরই প্রাধান্য।

ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বিষয় বলতে হালাল ও হারামের যে বিধান দিয়েছে তাকেই বুঝায়। এ বিধানগুলো সাধারণভাবে অপরিবর্তনীয়। সাধারণভাবে এ জন্য যে, এর মধ্যেও ব্যতিক্রমের অবকাশ আছে অবস্থা ও পরিস্থিতির কারণে।

ইসলামের মূল টার্গেট যেহেতু মানুষ, সে জন্য মানুষের প্রয়োজনে ইসলাম তার অপরিহার্য, চিরন্তন বা শাশ্বত বিধানেও ব্যতিক্রমের অবকাশ রেখেছে এবং তার নীতিমালা পুরোটাই তৈরি হয়েছে মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে। যেমন কোন মানুষ যদি এমন অবস্থায় পতিত হয় যে, হারাম খাদ্য ভক্ষণ না করলে সে মারা যাবে, সে ক্ষেত্রে তার জন্য হারাম খাদ্য ভক্ষণের অনুমতি প্রদান করে ইসলাম।

মানুষের বয়স, সামর্থ্য, মেধা, যোগ্যতা এসবকে সামনে রেখেই মানুষের জন্য ইসলাম তার বিধান পেশ করেছে। কারণ এ সবের আলোকেই পরকালে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে।

ফলে একজনের জন্য যা ফরজ অন্যের জন্য তা ফরজ নাও হতে পারে। যেমন বয়সের পার্থক্যের কারণে বড়দের জন্য নামায ফরজ হলেও শিশুর জন্য তা ফরজ নয়। ধনীর জন্য যে হজ্জ ফরজ গরীবের জন্য তা ফরজ নয়। একজন বিজ্ঞ আলেমের জন্য দাওয়াতে দ্বীনের কাজ যেভাবে বাধ্যতামূলক একজন মুর্খের জন্য তা নয়। বয়স হওয়ার পরও একজন পাগলের জন্য নামায ফরজ নয় তার বুদ্ধি-ভ্রান্তির কারণে।

ইসলাম কতটা মানবকল্যাণকামী তার পরিচয় পাওয়া যায় মুসাফিরের জন্য নামাযে ছাড় দেয়া থেকে। সফর একজন মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত শ্রান্ত করে দেয়। সফরে তার অতিরিক্ত ব্যস্ততা থাকতে পারে, সময় সংকীর্ণ হয়ে যেতে পারে– এসব সমস্যাকে সামনে রেখে চার রাকাতের ফরজ মুসাফিরের জন্য ৫০% ছাড় দিয়ে মাত্র দু'রাকাত করা হয়েছে। এ উদাহরণগুলো এ জন্য দিলাম যাতে এটা পরিষ্কার হয় যে, সবকিছু বিবেচনা করে যেখানে যতটুকু বাধ্যবাধকতা ও সুযোগ সুবিধা ইসলাম মানুষকে দিয়েছে তার আলোকেই মানুষের কর্মধারা নির্ধারিত হয়। ইসলাম মানুষের জন্য যা কিছু বৈধ করেছে গোড়ামীর কারণে কেউ যেন তাকে অবৈধ আখ্যা না দেয়, আবার অবৈধকে বৈধ করার জন্য অযথা শরীয়তের ফাঁক-

www.icsbook.info

ফোকড় না খোঁজে বেড়ায়। কারণ এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট না থাকলে ইসলামের শাশ্বত মূল্যমান (Values) উপলব্ধি করা কঠিন হবে। মানুষের সামগ্রিক কর্মধারা নির্ধারণে এ শাশ্বত মূল্যবোধগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

সংস্কৃতির টার্গেট পরিশুদ্ধ জীবন

ইসলাম যেমন মানুষের চিন্তার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে তার কর্মে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে চায়– সংস্কৃতির ও টার্গেট তাই। মানুষের চিন্তা ও কর্মে একটি পরিচ্ছন্ন রূপ ফুটিয়ে তোলাই সংস্কৃতির মূখ্য কাজ। বিশ্বাস থেকেই যেহেতু মানুষ কর্মে প্রবিষ্ট হয়, তাই মানুষকে তার বাঞ্ছিত কর্মধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য বা টিকিয়ে রাখার জন্য সংস্কৃতি প্রচেষ্টা চালায়।

সংস্কৃতি কি তার জবাব দিতে গিয়ে পণ্ডিতেরা বলেছেন– সংস্কার করা, পরিশুদ্ধ করা। এ সংস্কার হচ্ছে জীবনের সংস্কার, এ পরিশুদ্ধি জীবনের পরিশুদ্ধি। জীবনের অনতিপ্রেত চিন্তা ও কর্ম পরিত্যাগ করে সুস্থ সুন্দর শুদ্ধ জীবন যাপন করার নামই হচ্ছে সংস্কৃতি।

শেওলা পড়া, পলেস্তরা খসা, ভাঙাচুরা কোন প্রাসাদকে সংস্কার করা বলতে আমরা বুঝি প্রাসাদটির সকল অসংগতি দূর করে তাকে পুনরায় তার আসল চেহারায় ফিরিয়ে নেয়া, তাকে পুনরায় বসবাস উপযোগী করা। প্রাসাদটিকে তার আসল রূপ ও স্বমহিমায় ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হলেই আমরা বলি প্রাসাদটির সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আবার একটি প্রাসাদকে নিয়মিত ঝাড়পোছ করা, কোথাও রং উঠে গেলে সাথে সাথে সেটুকু ঠিক করে দেয়া এবং যখনি তাতে ছোটখাট কোন ত্রুটি দেখা দেয় সাথে সাথে তা সারিয়ে তুলে প্রাসাদটিকে সতত: বাসযোগ্য রাখার কাজটিও সংস্কার কাজ। প্রতিনিয়ত সংস্কারের মাধ্যমেই প্রাসাদটি তার স্বমহিমায় টিকে থাকে।

মানবজীবনের সংস্কারও এ স্থূল উদাহরণটিরই অনুরূপ। **মানুষের নষ্ট জীবনকে শিষ্ট জীবনে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টাকেই বলে সংস্কৃতি।**

ইসলামের যেমন মূল টার্গেট পরিশুদ্ধ জীবন, পরিশুদ্ধ মানুষ– সংস্কৃতিরও মূল টার্গেট জীবনের এই পরিশুদ্ধ রূপ। তাই **একজন প্রকৃত মুসলমান মানেই একজন পরিপূর্ণ সংস্কৃতিবান মানুষ। আবার একজন প্রকৃত সংস্কৃতিবান মানুষ মানে একজন পরিপূর্ণ ও যথার্থ মুসলমান।** প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে এ প্রত্যয় ও বিশ্বাস দৃঢ় ও অটুট থাকার ওপরই নির্ভর করে তার জাগতিক ও পারলৌকিক সাফল্য।

www.icsbook.info

ইসলাম ও সংস্কৃতি

ইসলাম পৃথিবীতে নিছক রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধনের জন্য আসেনি। ইসলাম এসেছে মানুষের চিন্তা ও কর্মকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। মানুষের চিন্তা ও কর্মের পরিশুদ্ধির এ প্রচেষ্টাকেই প্রচলিত পরিভাষায় বলা হয় ইসলামী আন্দোলন। সামগ্রিক অর্থে এ প্রচেষ্টার নামই সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

মানুষের আচার ব্যবহার থেকে শুরু করে জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড যে বিশেষ প্যাটার্নে গড়ে তোলার জন্য ইসলাম প্রচেষ্টা চালায়– সত্যিকার অর্থে সে বিশেষ প্যাটার্নে জীবনটি গড়ে না উঠা পর্যন্ত তা বিশুদ্ধ ও সংস্কৃতিবান হতে পারে না। কারণ ইসলমাই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ফলে ইসলাম ছাড়া জীবন পরিচালনা মানেই হচ্ছে, অপূর্ণাঙ্গ বিধান দ্বারা পরিচালিত হওয়া। আর অপূর্ণাঙ্গ বিধান দ্বারা জীবন পরিচালনার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে অসঙ্গতি ও ত্রুটিপূর্ণ জীবন যাপন করা। স্বাভাবিকভাবেই এ জীবন অসংস্কৃত বা অপসংস্কৃতির শিকার হতে বাধ্য।

এ জন্যই বলা যায়, পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া ছাড়া পরিপূর্ণ সংস্কৃতিবান হওয়া সম্ভব নয়, পরিপূর্ণ সংস্কৃতিবান হওয়া ছাড়াও সম্ভব নয় পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া। সংস্কৃতির চূড়ান্ত পরিণতি ও টার্গেট যে নির্মল ও বিশুদ্ধ জীবন সে বিশুদ্ধ জীবনের চর্চা দিয়েই ইসলাম তার যাত্রা শুরু করে।

একজন মুসলমান ও অমুসলমানের পার্থক্য

একজন মুসলমান ও অমুসলমানের চেহারা সুরতে কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য হয় তাদের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস এবং কর্মে। একজন মুসলমানের সাথে একজন অমুসলমানের পার্থক্য এখানেই যে, মুসলমান যে ভাবে ও যেমনটি বিশ্বাস করে এবং সে বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে যেভাবে তার কর্মকে ঢেলে সাজায়– একজন অমুসলিম তেমনটি বিশ্বাস করে না এবং সে কারণে মুসলমানের মত তার কর্মকে ঢেলেও সাজায় না।

যদি একজন মুসলমান ও অমুসলমানের চিন্তা ও কর্ম একই রকম হয় তবে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে কি? যদি মুসলমানদের চিন্তা ও কর্মে কোন বিশিষ্টতা না থাকে এবং অমুসলমানের মতই হয় মুসলমানের কর্মধারা তবে তাকে মুসলমান হিসাবে আখ্যায়িত করার কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে? যে কোন যুক্তিবাদী মানুষ বিশ্বাস ও কর্মের এ পার্থক্যের কারণেই দু'জন মানুষের একজনকে মুসলমান ও অপরজনকে অমুসলমান বলতে বাধ্য হবেন। কোরআন মানুষের বিবেকের কাছে প্রশ্ন তুলে ধরে বলছে, একজন অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? একজন মুসলমান ও অমুসলমানকে কোরআন এভাবেই চিহ্নিত করেছে।

www.icsbook.info

কিভাবে বিশ্বাস ও কর্মে পার্থক্য সৃষ্টি হয়

বিশ্বাস ও কর্মের এ পার্থক্য সৃষ্টি হয় মানুষের জ্ঞানের কারণে। মুসলমান জানে কে তাকে সৃষ্টি করেছে, এ পৃথিবীতে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? সে এও জানে, এ দায়িত্ব পালন না করার পরিণাম কি? মানুষ কোথা থেকে আসে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে আবার তারা কোথায় যায়?

এ জানার কারণে তার ভেতর যে প্রত্যয় জন্ম নেয় তার আলোকে সে তার কর্মকে ঢেলে সাজায়। এ জ্ঞান সে পড়াশুনা করেও আয়ত্ত করতে পারে আবার শুনে বা দেখেও আয়ত্ত করতে পারে। কাজেই সাহিত্য ও সংস্কৃতিই হচ্ছে এ জ্ঞান আহরণের প্রধান ও উত্তম হাতিয়ার।

অমুসলমান এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত থাকায় তার কর্মও হয় ত্রুটিপূর্ণ। আর এ ত্রুটিপূর্ণতার কারণেই কোরআন অমুসলমানকে উল্লেখ করেছে অন্ধ বলে। এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ জীবনই মূলতঃ অসংস্কৃত জীবন। কোন মুসলমানই এ ধরনের জীবন যাপন করতে পারে না।

প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনায় ইসলামী সংস্কৃতির ভূমিকা

প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনায় ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। একটি প্রাসাদ চমৎকার মডেলে উৎকৃষ্ট জিনিষপত্র দিয়ে বানানোর পরও দীর্ঘদিন সেখানে কেউ না থাকলে তা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। প্রাসাদটিকে বাসযোগ্য রাখার জন্য সেখানে নিয়মিত ঝাড়পোছ করতে হয়। এই নিয়মিত ঝাড়পোছ করাই সংস্কৃতির কাজ।

নানা অসঙ্গতি ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন অতিবাহিত করতে হয়। প্রতিদিনই নিত্য নতুন কর্মপ্রবাহে ঝাপিয়ে পড়তে হয় বেঁচে থাকার তাগিদে। কিন্তু আমার কাজ যেন অন্যের ক্ষতির কারণ না হয়, সভ্যতার এ বাগান যেন আমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এ জন্য সদা সর্বদা আমাদের সজাগ ও সচেতন থাকতে হয়। বিবেককে প্রতিনিয়ত এভাবে জাগ্রত জন্য প্রয়োজন হয় সংস্কৃতি চর্চার। এ সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়েই আমরা একটি পরিশীলিত জীবন লাভ করি।

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতিটি দিনকে সুন্দর করতে চাইলে প্রতিটি দিনই আমাকে সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে। জীবনকে সজীব রাখার জন্য যেমন প্রতিদিন আহার করতে হয়, আত্মাকে পবিত্র রাখার জন্য প্রতিদিন নামাজ পড়তে হয়, তেমনি জীবন প্রবাহের গতি ও ক্রমোৎকর্ষতার ধারা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয় প্রতিদিন সংস্কৃতি চর্চা।

www.icsbook.info

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব

আধুনিক বিশ্বে মুসলিম মিল্লাতের অনগ্রসরতার মূল কারণ ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার অভাব। ইসলামের মৌল বিশ্বাস ও চেতনার আলোকে মুসলমানগণ তাদের বিশ্বাস ও কর্মকে যতক্ষণ ঢেলে না সাজাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রহমত, বরকত ও কল্যাণ আশা করা বৃথা।

ইসলামের যে মূল দাবী মানুষের চিন্তা ও কর্মের সংস্কার ও পরিশুদ্ধি, সে সংস্কার ও পরিশুদ্ধি ছাড়া প্রকৃত অর্থে মুসলমানও হওয়া যায় না, সংস্কৃতিবানও হওয়া যায় না। তাই সংস্কৃতিবান হতে হলে প্রথমে মুসলমান হতে হবে আর মুসলমান হতে হলে সংস্কৃতিবান হতে হবে। কারণ সংস্কৃতির নিজস্ব কোন আদর্শ নেই। সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের আচরিত কর্ম প্রবাহের নাম। এ কর্ম প্রবাহ কোন্ আদর্শের নিরিখে সম্পন্ন হবে তার ওপর নির্ভর করে সংস্কৃতির স্বরূপ। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আদর্শের ভিত্তিতে এ কর্মধারা পরিচালিত হলে তা হবে সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ। এ জন্যই ইসলামহীন সংস্কৃতি মূলত: অপসংস্কৃতির নামান্তর।

প্রকৃত সংস্কৃতি জীবনের যে সংস্কার ও পরিশুদ্ধি চায়, সে পরিশুদ্ধ জীবন ইসলামের শুদ্ধ চিন্তার আলোকে গড়ে তুললেই কেবল পরিপূর্ণতা পেতে পারে। তাহলেই কেবল কারো পক্ষে একাধারে মুসলমান ও সংস্কৃতিবান হওয়া সম্ভব।

ইসলামে সংস্কৃতি চর্চা হবে কোন মাধ্যমে

ইসলাম ছাড়া যেহেতু আর কোন শুদ্ধ আদর্শ নেই– মানব রচিত তো নয়ই, এমনকি ঐশী আদর্শও এবং সংস্কৃতি ছাড়া জীবন গতিহীন ও অচল হয়ে পড়ে, সে জন্য সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমেই ইসলামের বিকাশ ঘটাতে হবে। যে সব মাধ্যমে বাতিল শক্তি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালাচ্ছে সে সব মাধ্যমকেই ব্যবহার করতে হবে ইসলামের স্বপক্ষে। তবে তা করতে হবে অবশ্যই ইসলামের আলোকে, ইসলামী আদর্শের মৌলিক মূল্যমানকে অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে যেটুকু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়, সেটুকু ত্যাগ অবশ্যই মুসলমানদেরকে স্বীকার করে নিতে হবে।

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার স্বরূপ

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার স্বরূপ কি হবে এ এক গুরুতর প্রশ্ন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বাতিল যেভাবে এবং যেমনটি করছে ইসলামী আদর্শের ধারক বাহকেরাও কি সেভাবে এবং তেমনটি করবে? তারাও কি সেভাবে নাচবে, গাইবে, হাসবে, খেলবে? সেই একইভাবে একই ছন্দে জীবন যাপন করবে?

যদি সেভাবে এবং তেমনটি না করা হয় তবে সাংস্কৃতিক জীবন আকর্ষণহীন ও

www.icsbook.info

নিস্প্রভ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ আনন্দময় ভুবনের হাতছানিকে অগ্রাহ্য করে নিরানন্দময় জীবনকে বরণ করে নিতে ইচ্ছুক হবে না।

কিন্তু যদি ইসলামের কমন ভ্যালুজকে অক্ষুন্ন না রেখে হুবহু বাতিলের মত সাংস্কৃতিক তৎপরতায় লিপ্ত হয় মুসলমানগণ, তবে আলাদাভাবে মুসলমানদের এ সাংস্কৃতিক তৎপরতা চালাবার কোন প্রয়োজন থাকে কি? তাহলে মুসলমানদের যে আলাদা কৃষ্টি-কালচার, আলাদা ইতিহাস-ঐতিহ্য আছে সেটিই বা প্রমাণ হবে কিভাবে?

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার স্বরূপ কি হবে এ দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে সামনে রেখেই তা নির্ণয় করতে হবে। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে এমন একটি পথ বের করতে হবে যেখানে একাধারে আনন্দময়তা ও শরিয়তের সীমারেখা উভয়ই বজায় থাকবে।

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার ভিত্তি

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। ইসলামের যে কমন ও অপরিহার্য মূল্যমান, যে বিশ্বাস ও আচরণ ইসলাম একজন মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে তার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে এমন কোন কিছু ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে শামিল হতে পারে না।

মানুষের জন্য হালাল-হারামের যে বিধান ইসলাম দিয়েছে, যে সব কাজকে ইসলাম অবশ্য পালনীয় ও বর্জনীয় বলে ঘোষণা করেছে, যে কোন মূল্যে সে সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করেই ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে। এ সীমারেখাকে অবহেলা করে বা কৌশলের নামে তাকে অবজ্ঞা করে যা করা হবে তা আর যাই হোক ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

প্রধানত: তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ইসলামী সংস্কৃতির প্রাসাদ নির্মিত হয়। বিষয়গুলো হচ্ছে:

১. তাওহীদ। ২. রিসালত। ৩. আখিরাত।

তাওহীদ

তাওহীদ হচ্ছে ঈমানের বুনিয়াদ। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এটুকু বিশ্বাস করাই তাওহীদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। রাসূলের জামানায় তৎকালীন আরব মুশরিক এবং কাফেররাও এটুকু বিশ্বাস করতো। তাওহীদে বিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তিনিই মানুষের রিজিকদাতা, পালনকর্তা এবং একমাত্র অভিভাবক। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর ইবাদতের জন্য– আর দুনিয়ার সব কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। ভয় একমাত্র

www.icsbook.info

তাকেই করতে হবে– সাহায্য চাইতে হবে তারই কাছে। মানুষের ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সব তার হাতে।

মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য তিনি যে বাণী পাঠিয়েছেন, যে বাণী লিপিবদ্ধ আছে পবিত্র কোরআনে– জীবন পরিচালনা করতে হবে সে কোরআনের আলোকে। কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। এ ইবাদত নিছক কিছু আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়– মানুষের জীবনের প্রতিটি কর্মই ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যদি তা সাধিত হয় ইসলামের বিধি-বিধান মোতাবেক।

নামায যেমন একটি ইবাদত– তেমনি নামায শেষে রিজিকের সন্ধানে পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ার জন্য আল্লাহ যে তাকিদ করেছেন, সে তাকিদের কথা স্মরণ রেখে হালাল পথে উপার্জন করাও একটি ইবাদত। তেমনি ইবাদত পরিবার প্রতিপালন এমনকি স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা পর্যন্ত। কারণ আল্লাহ স্ত্রীর হক আদায় করার জন্যও তাকিদ করেছেন। কিন্তু যখন কেউ এ হালাল পথ পরিত্যাগ করে অন্য কোন পন্থায় যৌবনের চাহিদা মেটায় তখনই তা হারাম হয়ে যায়।

এমনিভাবে আল্লাহর যাবতীয় গুণগরিমা, বৈশিষ্ট, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করা এবং তার যাবতীয় হুকুম আহকাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার জন্য সর্বদা সজাগ সতর্ক থাকার নামই তাওহীদ বিশ্বাস। এ বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য আসা মানে হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য থেকে সরে দাঁড়ানো। কোন অবস্থাতেই এ বিশ্বাসে শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষের মনে এ তাওহীদ বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে হবে। শয়তান বিরামহীনভাবে এবং প্রতি মুহূর্তে মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করতে সচেষ্ট। এ জন্য ইসলামী সংস্কৃতির চর্চাও হওয়া উচিত বিরামহীন ভাবে এবং প্রতিনিয়ত। ইসলামী সংস্কৃতিকে এ ক্ষেত্রে দ্বিবিধ ভূমিকা পালন করতে হবে।

১. তাওহীদের এ চেতনায় যেন কোন প্রকার শিথিলতা আসতে না পারে তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।
২. তাওহীদের এ চেতনা যেন দৃঢ় আস্থার ওপর দাঁড়াতে পারে এবং উত্তরোত্তর এ চেতনা প্রাণবন্ত, তীক্ষ্ণ, সজীব ও বৃদ্ধি পায় তার জন্যও সচেষ্ট হতে হবে।

অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রতিটি মুসলমানকে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তাওহীদের চেতনায় বিন্দুমাত্র শিথিলতা আনতে পারে এমন কোন কিছুকে সংস্কৃতির নামে আদৌ কোন প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

www.icsbook.info

রিসালাত

মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ অসংখ্য নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাকে দ্বীন ও হেদায়েতসহ পাঠিয়েছেন। তিনিই মানব জাতির একমাত্র আদর্শ নেতা ও শিক্ষক। তাঁর নেতৃত্ব ও শিক্ষার বিপরীত কোন কিছু মানবতার জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাঁর নেতৃত্ব ও শিক্ষার বিপরীত সকল নেতৃত্ব বাতিল যোগ্য।

ইসলাম পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে: 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর আল্লাহর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের।' অর্থাৎ রাসূলের নেতৃত্বের বিপরীত নেতৃত্বকে বাতিল করার সাথে সাথে কোন্ নেতৃত্বের আনুগত্যের ছায়ায় জীবন কাটাতে হবে তাও পরিষ্কার করে বলেছে ইসলাম। তাই কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি যুগেই মুসলমানদের সে যুগের ইসলামী নেতৃত্বকে বরণ করে নিতে হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

ইসলামী সংস্কৃতির কাজ হলো মানুষের মনে রাসূলের নেতৃত্বের বিপরীত পৃথিবীর অন্য কোন নেতৃত্বের প্রতি যেন কারো মোহ সৃষ্টি না হয় মানুষের মনকে সেই উপলব্ধিতে উজ্জীবিত রাখা। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নেতৃত্বসহ অন্য সকল অনৈসলামিক নেতৃত্বকে অস্বীকার করার মত মনের জোর মানুষের মনে জাগিয়ে তোলা এবং তাকে জাগরুক রাখা। আদর্শ নেতা হিসাবে রাসূলকে (সা.) হৃদয়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা।

আখিরাত

মানুষকে এ দুনিয়ায় আল্লাহ পাঠিয়েছেন তার ইবাদত করার জন্য। একদিন এ দুনিয়ার জিন্দেগী শেষ হয়ে যাবে। মানুষকে পুনরায় ফিরে যেতে হবে আল্লাহর দরবারে। যিনি আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করবেন, পরকালে তিনি অত্যন্ত কল্যাণ ও সুখময় জান্নাত লাভ করবেন, আর যে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করবে না তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অনন্ত আজাব।

জীবনের প্রতিটি কাজে মানুষকে তাই ভাবতে হবে, যে কাজটি আমি করছি তা কি পরকালে আমার নাজাতের ওসিলা হবে, নাকি তা আমার জন্য বয়ে আনবে জাহান্নামের কঠিন আজাব?

আখিরাতের এ চিন্তা মানুষকে সকল পাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। সদা সর্বদা এ চিন্তা স্মরণে থাকলে মানুষের পক্ষে অন্যায় ও পাপ কাজ করা সত্যিই কঠিন। সুযোগ-সুবিধা এবং সামর্থ থাকার পরও শুধুমাত্র এ একটি কারণেই মানুষ সব

www.icsbook.info

খারাপ কাজ থেকে নিজকে দূরে রাখতে যে সচেষ্ট হয়– তার অসংখ্য নজির ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

ইসলামী সংস্কৃতির কাজ হচ্ছে মানুষের দীলকে সর্বদা আখিরাতমুখী করা। সংস্কৃতির বিভিন্ন তৎপরতার মধ্য দিয়ে বার বার আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই কেবল একটি কল্যাণময় ইসলামী সমাজের আশা করা যেতে পারে।

বস্তুত: ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার ভিত হচ্ছে এ তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত। যে সকল কর্মকাণ্ড মানুষকে এ মৌলিক চেতনার স্মরণ থেকে ফিরিয়ে রাখে তাই অনৈসলামিক সংস্কৃতি, আর যে সব তৎপরতার মধ্য দিয়ে এ সকল চেতনা জাগ্রত, শাণিত ও মজবুত হয় তাই ইসলামী সংস্কৃতি।

ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি

কোন জাতির বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনার বিশেষ গুণান্বিত আঙ্গিকের পরিশীলিত ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশকেই সংস্কৃতি বলে। ইসলামী জীবন দর্শনের আলোকে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়, সেই ফলিত সংস্কৃতিই মূলত: ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধসমূহ সক্রিয় থাকবে। তথা সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি ইসলামী ভাবধারার পরিচায়ক হবে। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামের মৌল বিশ্বাসের ভিত্তিতে যত নিয়মাবলী, বিধিব্যবস্থা পালনীয়, এগুলোই ইসলামী সংস্কৃতি– যাকে 'দ্বীন' বলা যায়। এই **দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের পরিপূর্ণ রূপায়নের যে আচরিত রূপ, তাই ইসলামী সংস্কৃতি।**

ইসলামী জীবন চেতনা ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোন সংস্কৃতির নাম আর যাই হোক না কেন সেটা ইসলামী সংস্কৃতি নয়। ড: সাইয়েদা ফাতেমা সিদ্দীকা তাঁর 'ইসলামী সংস্কৃতি' পুস্তিকায় লিখেছেন:

A culture is code of life, to be more precise a code of human conduct for development of human life and ideal.

কোন জাতির সংস্কৃতি তার পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যকে অপরের কাছে তুলে ধরে। যেই জাতির যেই জীবন দর্শন ও আকীদা-বিশ্বাস তার সংস্কৃতিতে সেটাই প্রতিবিম্বিত হয়। এ কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি বিভিন্ন। আর সেই বিভিন্নতার দরুণই অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি থেকে মুসলিম সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানরা অপরের সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নিলেও সেটি কেবল ঐসব ক্ষেত্রেই সীমিত, যা তাদের জীবনবোধ, জীবন চেতনা,

www.icsbook.info

আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কোথাও এই নীতিবিচ্যুতি ঘটার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন বিজাতীয় সংস্কৃতি প্রাধান্য পেলে সেটাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা যাবে না। কারণ **কোন সংস্কৃতি কোন মুসলমান চর্চা করলেই সেটা ইসলামী সংস্কৃতি হয়ে যায় না**। ইসলামী জীবনবোধের বিপরীত ভাবাদর্শজনিত কোন আচার-আচরণ ও কৃষ্টি সংস্কৃতি কোন মুসলিম সম্প্রদায়ে পরিদৃশ্যমান হলে তখনই ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ সেটাকে অন্য নামে আখ্যায়িত করেছেন। তাকে 'বেদায়াত' কুসংস্কার বা 'তাশাববুহ বিল কাওমিল আখের' বা 'অপর জাতির ধর্মবিশ্বাসজনিত কাজের সাথে সাদৃশ্য' বলে সেটিকে আখ্যায়িত করেছেন ও প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মহানবী (সা.) কঠোরভাবে নিষেধ করে বলেছেন: "কেউ অপর জাতির (বিশ্বাসজনিত কাজ ও আচার-আচরণের) অনুকরণ করলে সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।" যেমন খ্রীষ্টানরা কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর উক্তির পরিপন্থী এটা বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে ক্রুশবিদ্ধ করে মারা হয়েছে। তাই সেটির অনুকরণে তাদের ক্রস চিহ্ন গলায় পরিধান করা, তা বাসভবনে রাখা বা গৃহের প্রাচীরগাত্রে কিংবা চিকিৎসা হাসপাতালে অথবা অন্য কোন দাতব্য কর্মকাণ্ড বা গলার নেকটাইতে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করাকে তারা তাদের সংস্কৃতির অঙ্গে পরিণত করে নিয়েছে বিধায় কোনো মুসলমান কর্তৃক সেটার ব্যবহার আপত্তিকর। খ্রীষ্টানগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থার সেবাধর্মী মানবিক কাজকর্মসমূহকে মুসলমানগণ সমর্থন করলেও তাদের ধর্মবিশ্বাসসঞ্জাত সংস্কৃতির অঙ্গ ক্রুশ চিহ্নের ব্যবহারকে তারা এজন্য অবৈধ মনে করে এবং নিজ দেশের এই সেবা সংস্থার চিকিৎসা সেবাধর্মী কাজের প্রতীক হিসাবে মুসলমানরা 'হেলাল-এ আহমার' বা রেডক্রিসেন্ট ব্যবহার করে থাকে। এভাবেই ইসলামী সংস্কৃতি তার আপন স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে ও বজায় রাখে।

কিন্তু কোথাও যদি এ স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত না হয় এবং মুসলমানদের অবহেলা ও অসতর্কতার সুযোগে মুসলিম সমাজে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে তা দীর্ঘদিন যাবত চর্চিত হতে থাকে, তখন তাকেও ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গ মনে করা হতে পারে। যেমন, মুসলিম রাজা বাদশাহদের দরবারের অনেক কাহিনী আমাদের সমাজে প্রচলিত, যার সাথে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সংস্কৃতির কোন পার্থক্য নেই। বিশেষত: মোগল ও বাগদাদের রাজতান্ত্রিক মুসলিম বাদশাহের দরবারী সংস্কৃতি। কালক্রমে এ সব সংস্কৃতি মুসলিম সংস্কৃতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এ সব সংস্কৃতির সাথে ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধের বিস্তর পাথর্ক্য বিদ্যমান। এ সংস্কৃতি কিছুতেই ইসলামী সংস্কৃতি হতে পারেনা। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, মুসলমান কোন সংস্কৃতি চর্চা করে আসছে বলেই তা ইসলামী সংস্কৃতি

www.icsbook.info

পদবাচ্যের অধিকারী হয়ে যায় না। সেই সংস্কৃতি ইসলামী জীবন দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিশ্বাসসঞ্জাত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ইসলামী মূল্যবোধের অনুকূল বা অন্তত ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন সংস্কৃতিই কেবলমাত্র ইসলামী সংস্কৃতি অভিধায় অভিহিত হতে পারে।

ইসলামী সংস্কৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতি

ভৌগলিক এলাকার আবহাওয়া ও পরিবেশগত পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন জীবনাচার আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্রের এক অনুপম নিদর্শন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বার বার একথা ঘোষণা করেছেন যে, ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্রের নিদর্শন। জীবনাচারের এ পার্থক্যের ফলে স্বাভাবিকভাবেই অঞ্চল ভেদে পৃথক পৃথক সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে। মানুষ স্থানীয়ভাবে বিকশিত এ সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এ স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবে কিছু কিছু ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির লোকজন পারস্পরিক বিভেদ ভুলে একই ধরনের আচরণ করে থাকে। যেমন শীত প্রধান অঞ্চলের জনসাধারণ স্বাভাবিক ভাবেই শীত প্রতিরোধক পোশাক পরিধান করে। এ ক্ষেত্রে ধর্ম বর্ণের পার্থক্য কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

মরুভূমি অঞ্চলের জীবনাচারের সাথে বন্যাতাড়িত অঞ্চলের মানুষের জীবনাচার এক হবে না এটাই স্বাভাবিক। এর ফলেই এ দু'অঞ্চলের সংস্কৃতির মধ্যে একটা পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে বিশ্বব্যাপী স্থানে স্থানে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে ইসলামের সম্পর্ক কেমন হতে পারে সংস্কৃতি চর্চার বেলায় তাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমত: ইসলাম কি স্থানীয় সংস্কৃতিকে বাতিলযোগ্য বলে ঘোষণা দেয় নাকি নির্বিশেষে স্থানীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নেয়– এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে সামনে রেখেই। ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি যে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত– স্থানীয় সংস্কৃতির যে অংশটুকু এ মৌল বিশ্বাসের অনুকূল, ইসলাম সেটুকু তার নিজের সংস্কৃতির সাথে একীভূত করে নেয়।

দ্বিতীয়ত: যে অংশটুকু এ মৌল বিশ্বাসের অনুকূল নয় আবার প্রতিকূলও নয়, সে অংশটুকু অর্থাৎ এ মৌল বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেটুকুকেও ইসলাম তার নিজের সংস্কৃতির মধ্যে স্থান দেয়। অর্থাৎ সংস্কৃতির কোন অংশ ইসলামের অনুকূল হোক বা না হোক কেবলমাত্র ইসলামের সাথে বিরোধহীন হলেই সেটুকু ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে শামিল হতে পারে। এ উদারতার কারণেই ইসলাম খুব দ্রুত বিশ্বব্যাপী বিস্তারিত হতে পেরেছে।

www.icsbook.info

তৃতীয়ত: স্থানীয় সংস্কৃতির যে অংশটুকু ইসলামী বিশ্বাস ও চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক, অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর বিপরীত– সে অংশটুকু ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাওহীদের পরিবর্তে যা শিরকিয়াতকে উৎসাহিত করে, রিসালাতের ধারণাকে বিকৃত বা ভুলুণ্ঠিত করে এবং সর্বোপরি আখেরাতমূখী চেতনার পরিবর্তে ভোগবাদী চেতনার বিস্তার ঘটায়– ইসলাম সংস্কৃতির সেসব কাজকে অনৈসলামিক সংস্কৃতি বিবেচনা করে। ইসলামে এ অপসংস্কৃতির চর্চা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মানুষের জীবনকে অপসংস্কৃতির কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলামী সংস্কৃতি নিরন্তর প্রচেষ্টা চালায়।

গ্রাম বাংলায় ধান-দুর্বা দিয়ে বধুর বরণ করার রেওয়াজ কোথাও কোথাও দেখা যায়। এ ধান-দুর্বাকে নতুন বর বধুর সৌভাগ্যের প্রতীক কল্পনা করা হয়। এটি এক ধরনের শেরেকি ধারণা। কারণ ধান-দুর্বা দিয়ে বধু বরণ করলেই নবদম্পতি সৌভাগ্যের সাগরে হাবুডুবু খাবে এমন ধারণা আল্লাহ যে একমাত্র সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের মালিক এ ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। ফলে এ ধরনের শেরেকি সংস্কৃতি ইসলামে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। কিন্তু কৃষি প্রধান এ দেশে নতুন ধান এলে খুশীতে যদি কৃষকরা আনন্দে মেতে ওঠে সে আনন্দে শরীক হতে ইসলামে বাধা নেই। এভাবেই ইসলামী সংস্কৃতি স্থানীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ বা বর্জন করে।

ইসলামী আন্দোলন ও সংস্কৃতি চর্চা

ইসলামকে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার অব্যাহত ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার নাম ইসলামী আন্দোলন। ইসলামী আন্দোলনের মুখ্য টার্গেট দুটি।

ক) সমাজের সকল স্তরে অন্য সকল মতবাদ ও শক্তির ওপর ইসলামকে বিজয়ী করা।

খ) সমাজে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণ করা। ইসলামী আকিদা ও আমল ধ্বংস হতে পারে এমন সব তৎপরতার গতিরোধ করা।

এ দুটো উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে ইসলামী সংস্কৃতি ও রাজনীতির ব্যাপক চর্চা প্রয়োজন। ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা ছাড়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণ করার আর কোন বিকল্প মাধ্যম নেই। প্রতিনিয়ত মানুষকে যদি ইসলামী আচার আচরণে অভ্যস্ত করে তোলা যায় তবেই সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ সমূহ টিকে থাকতে পারে। **প্রতিনিয়ত ইসলামী আচার আচরণে অভ্যস্ত রাখার যে প্রক্রিয়া সে প্রক্রিয়াকেই বলা যায় ইসলামী সংস্কৃতি।**

দ্বিতীয়ত: ইসলামকে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিজয়ী আসনে সমাসীন করতে হলে প্রথমেই সমাজের মানুষগুলোর ধ্যান ধারণা, চিন্তা ও কর্মকে ইসলামের আলোকে

www.icsbook.info

গড়ে তুলতে হবে। সমাজের মানুষগুলো সর্বস্তরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেই কেবল সে সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম বিজয়ী হতে পারে। মানুষের চিন্তা ও কর্মে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার মাধ্যম ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা যতটা জোরদার হবে মানুষ ততই ইসলামী অনুশাসন পালনে অভ্যস্ত হবে। তাই **ইসলামের রাজনৈতিক বিজয় নির্ভর করে সাংস্কৃতিক সাফল্যের ওপর।**

এ জন্য সাধারণ ভাবে সকল মুসলমানকে ইসলামী সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নিজেদের বিশ্বাস ও আচরণ এতটা পরিশুদ্ধ ও সংস্কৃত করতে হবে, যেন সাধারণ মুসলমান এমনকি অমুসলমানরাও তাদেরকে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় এবং ইসলামী আন্দোলনের এক একজন কর্মীকে তারা নিজেদের মডেল হিসাবে গ্রহণ করে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এ পরিশুদ্ধ জীবন গড়ার হাতিয়ার হচ্ছে সংস্কৃতি।

ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, আর দশটা মতবাদের মত যেন তেন প্রকারে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা তাদের টার্গেট নয়। ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ইসলামী কায়দায়। অন্যায়, অসত্য ও জুলুমের পথে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য ন্যায় অন্যায় বোধ বিসর্জন দিতে অনুমতি দেয় না ইসলাম। হককে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সতত: হকের পথে, এটাই ইসলামের শিক্ষা।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরবের লোকেরা স্বেচ্ছায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব করেছিল। মহানবী (সা.) ইচ্ছা করলে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে ব্যবহার করে ইসলাম কায়েমের পদক্ষেপ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে পথ গ্রহণ করেননি। তিনি দাওয়াতের মাধ্যমে একদল লোককে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করে তাদের জীবন ধারায় এক অভাবিত পরিবর্তনের সূচনা করেন। অতঃপর এ লোকগুলো যখন ইসলামী জীবনাচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো এবং অমুসলিমদের সাথে সুস্পষ্ট সাংস্কৃতিক পার্থক্য সূচিত করলো তখন তাদের নিয়ে তিনি মদিনায় এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দিলেন। এ রাষ্ট্রটি কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোত্তম মডেল হিসাবে বিবেচিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

ইসলামে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের এটাই পদ্ধতি, এটাই রাসূলের সুন্নত। এ পদ্ধতির খেলাফ কোন পদ্ধতিতে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে না। এ জন্য যারাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাবেন প্রথমে তাদেরকে সমাজের বুকে ইসলামী সংস্কৃতির মজবুত ভিত গড়ে তুলতে হবে। এ ভিতের উপরই দাঁড়িয়ে থাকবে ইসলামের বর্ণালী প্রাসাদ।

www.icsbook.info

দাওয়াতী কাজে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবহার

মুসলমানরা একটি মিশনারী জাতি। আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে যে সত্য আমানত স্বরূপ তাদের কাছে সংরক্ষিত আছে সে সত্য বিশ্বময় প্রচার করার কঠিন দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত। এ দায়িত পালন করা প্রতিটি মুসলিম নরনারীর ওপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের প্রচার প্রোপাগাণ্ডা মূলত: পুরোটাই সংস্কৃতি নির্ভর। বর্তমান সময়ে প্রচার মাধ্যম যার দখলে পৃথিবীর কর্তৃত্ব মূলত: তারই হাতে নিবদ্ধ। প্রচারের গুণে মিথ্যা সত্যের রূপ পরিগ্রহ করে আর সত্য পর্যবসিত হয় মিথ্যায়। সংস্কৃতির প্রতিটি মাধ্যম প্রচারের এক একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

এমতাবস্থায় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে বিশ্বে ইসলামের প্রভাব বিস্তারের আর কোন বিকল্প হাতিয়ার নেই। ব্যক্তিগত আচার আচরণ থেকে শুরু করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবিত উন্নয়নের সকল ফসলগুলো সংস্কৃতি নির্ভর হয়ে বিশ্বব্যাপী যে ব্যাপক মানসিক বিবর্তন ঘটাচ্ছে তার মোকাবেলা করা একমাত্র সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমেই সম্ভব। কোরআন হেকমত ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে দ্বীন প্রচারের যে আদেশ করেছে তার অনিবার্য দাবীই হচ্ছে যুগের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ারসমূহ ব্যবহার করে শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতিতে ইসলামের প্রচার করা। **পুরনো দিনের প্রযুক্তি অকার্যকর বিবেচিত হলে সাথে সাথে নতুন দিনের নিত্য নব প্রযুক্তি গ্রহণ করে দ্বীন প্রচারের কাজে ব্রতী না হওয়া একটি মারাত্মক অপরাধ।** গোড়ামী বা কুপমণ্ডুকতার কারণে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তার পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য।

তলোয়ারের মোকাবেলা করতে হয় তলোয়ার দিয়ে, জবানের মোকাবেলায় ব্যবহার করতে হয় সমৃদ্ধ জবান। অস্ত্র দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক হামলার মোকাবেলা করা যায় না, সাংস্কৃতিক হামলা প্রতিরোধ করা যায় না বিত্তবেসাত দিয়ে। প্রতিটি হামলার অস্ত্র যেমন ভিন্ন তেমনি ভিন্নতর অস্ত্র দিয়েই তার মোকাবেরা করতে হয়।

যেহেতু এখন উপর্যুপরি আঘাত হানা হচ্ছে সংস্কৃতির পথে, মুসলমানদের ঈমান ও আমল বিনষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে সর্বব্যাপী সাংস্কৃতিক হামলা, সে জন্য এর মোকাবেলায় শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। একদিকে মুসলমানদের ঈমান ও আমলের সংরক্ষণ এবং অন্যদিকে অমুসলমানদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা এই উভয়বিধ কাজের জন্যই এ মুহূর্তে সর্বাগ্রে সাংস্কৃতিক তৎপরতায় নিজেকে জড়িত করে নেয়া ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর জন্য অপরিহার্য।

এ কথার মানে এ নয় যে, ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি নেতা ও কর্মীকে এখন

www.icsbook.info

গান গাওয়া শিখতে হবে, অভিনয় শিখতে হবে এবং এ ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজকে জড়িয়ে ফেলতে হবে। বরং এ কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, যাদেরকে আল্লাহ স্বাভাবিকভাবে এসব যোগ্যতায় ভূষিত করেছেন অতি অবশ্যই তাদেরকে এসব কাজে নিয়োজিত হতে হবে। যারা গাইতে পারেন, লিখতে পারেন, অভিনয় করতে পারেন বা এ ধরনের অন্য কোন সাংস্কৃতিক কাজ করতে পারেন তারা অবশ্যই তা করবেন।

কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ এসব গুণের চাইতে অন্যবিধ যোগ্যতা বেশী দিয়েছেন তারা সে যোগ্যতারই বিকাশ সাধন করবেন। কিন্তু তাই বলে দাওয়াতী দায়িত্ব বিস্মৃত হওয়া কারো জন্যই সংগত বিবেচিত হতে পারে না। এই নিরিখে সাংস্কৃতিক তৎপরতার কাজগুলো এভাবে বিভাজন করা যেতে পারে। যাদের আল্লাহ সাংস্কৃতিক কর্মী হওয়ার মত যোগ্যতা দিয়েছেন তারা এ মনোভাব নিয়েই কাজ করবেন যে, আল্লাহ প্রদত্ত এ সাংস্কৃতিক প্রতিভার যথাযথ ব্যবহার না করলে যোগ্যতার অপব্যবহারের জন্য পরকালে তাকে জবাবদিহী করতে হবে।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কর্মী হওয়া মানেই উন্নততর মানুষ হিসাবে নিজকে পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নিজকে তিনি শ্রেষ্ঠ মুসলমান হিসাবে উপস্থাপিত করবেন। নিজকে শ্রেষ্ঠ মুসলমান হিসাবে পেশ করার মানে হচ্ছে, তিনি সাধারণ মানুষের চাইতে ইসলামকে বেশী জানবেন, কোরআন ও হাদিসের প্রত্যয় ও জ্ঞানে তিনি হবেন অধিক পারদর্শী। তিনি ইসলামকে জানা ও মানার ক্ষেত্রে অন্য সকলের চাইতে অগ্রগামী হবেন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম মুসলমান হিসাবে নিজেকে পেশ করার জন্য নিরন্তর ও ক্রমাগত প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখবেন।

ইসলামী সংস্কৃতির যে সব হাতিয়ার তারা তৈরি করবেন তা তারা এ জন্যই তৈরি করবেন যে, এটাই হচ্ছে তাদের ওপর ইসলামের অপরিহার্য দাবী। তাদেরকে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, তারা যা উপহার দিচ্ছেন তা কেবল তাদের নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং তা ছড়িয়ে পড়বে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। ফলে, যদি কোন ভুল তারা করেন, তার প্রভাব পড়বে পুরো সমাজে। এতে যদি কোন পাপ হয় তবে তার দায়ভাগ তাদেরই বহন করতে হবে। এ জন্য তারা যা কিছুই উপহার দেবেন তা ইসলাম সম্মত হয়েছে কিনা তা গভীরভাবে বিবেচনা করে তবেই তা জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন। তাদেরকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তারা যা উপহার দিচ্ছেন তা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে কিনা। মূলত: তাদের মেধা, যোগ্যতা ও ভূমিকার উপরই যেহেতু এসব জিনিসের সৌকর্য ও সৌন্দর্য নির্ভর করছে সে জন্য কোন কিছু সৃষ্টি করার সময় তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে চূড়ান্ত শ্রম ও সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার জন্য সর্বোতভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

www.icsbook.info

সংস্কৃতি কর্মীরা যা কিছুই উপহার দেবেন, তা তারা দেবেন অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণা ও প্রেরণার তাগিদে। কেউ তাদের কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন, এ জন্য আশা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। বরং সমাজকে তারা যা কিছু উপহার দিতে চান তা দেয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টির জন্যও তারা সচেষ্ট হবেন।

সাংস্কৃতিক কাজে পৃষ্ঠপোষকতা দান

যারা সমাজপতি বা নেতৃত্বের আসনে থাকবেন ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার দায়ভাগ তাদের উপরই বেশী বর্তায়। সমাজের প্রতিটি অঙ্গন যেন ইসলামের আলোকে গড়ে উঠে সে জন্য ভারসাম্যপূর্ণ কর্মসূচী দেয়ার দায়িত্ব তাদের। এক্ষেত্রে বর্তমান সময় যেহেতু সাংস্কৃতিক তৎপরতা জোরদার করার দাবী জানাচ্ছে সে জন্য এ অঙ্গনে কাজ বৃদ্ধি করার দায়িত্ব তাদেরকেই বহন করতে হবে। রাজনৈতিক তৎপরতা জোরদার করার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক তৎপরতা বৃদ্ধির গুরুভার বহনে তারা যত বেশী সক্ষম হবেন সমাজ তত দ্রুত ইসলামের দিকে এগিয়ে আসবে। শিল্পীরা শিল্প চর্চা করে কিন্তু তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে অন্যরা। পৃষ্ঠপোষকতা যত জোরদার হয় শিল্প চর্চা তত বৃদ্ধি পায়। এ জন্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পৃষ্ঠপোষকতা বাড়াতে হবে।

দ্বিতীয়ত: শিল্পীদের সংগঠিত করার দায়িত্বও তাদেরকেই গ্রহণ করতে হবে। বেছে বেছে ভাল সংগঠকদেরকে দায়িত্ব দিতে হবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের। **সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সংগঠক হওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক কর্মী বা শিল্পী হওয়া জরুরী নয়– জরুরী হচ্ছে সংস্কৃতির সমঝদার হওয়া। একটি সুন্দর প্রাসাদ তৈরীর কৃতিত্ব যতটা উত্তম কারিগরের তার চাইতে অনেক বেশী কৃতিত্ব তার– যিনি সে প্রাসাদটি নির্মাণ করান। মূলত: তার চাহিদাকেই কার্যকর করে তোলেন সংশ্লিষ্ট কারিগর।** এজন্য লোকে কোন্ কারিগর বাড়িটি বানিয়েছে তার প্রশংসা করার চাইতে যিনি প্রাসাদটি নির্মাণ করিয়েছেন তারই প্রশংসা করে বেশী।

যে বাইশ লক্ষ শ্রমিক তাজমহল বানিয়েছে জগত তাদের চেনে না– তারা চেনে সম্রাট শাহজাহানকে– যিনি তাজমহলকে নির্মাণ করিয়েছেন। **সমাজপতিরা বা নেতারা যখন সম্রাট শাহজাহানের ভূমিকা পালন করবেন কেবল তখনই সাংস্কৃতিক কর্মীরা বাইশ লক্ষ শ্রমিক হয়ে সংস্কৃতির তাজমহল গড়ে তুলতে পারবেন।** অন্যথায় শ্রমিকরা ছড়িয়ে থাকবে সমাজের বুকে কিন্তু কোন তাজমহল নির্মিত হবে না। বস্তুত ইসলামী নেতৃত্বের উপরই এ অপরিহার্য দায়িত্ব অর্পিত যে, তারা সঠিক সিদ্ধান্ত ও কার্যকরী পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সংস্কৃতির পরিমণ্ডলকে

www.icsbook.info

ইসলামের আলোকে গড়ে তুলবেন।

তৃতীয়ত: ইসলামী আন্দোলনের যারা সাধারণ কর্মী ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে তাদের ভূমিকা এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের সচেতন ও যথাযথ ভূমিকা ছাড়া ইসলামী সংস্কৃতি কিছুতেই বিস্তার লাভ করতে পারে না। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা যা সৃষ্টি করেন সে সৃষ্টিকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব তাদেরই। কবি ও শিল্পীরা সর্বক্ষণ বিভোর থাকবেন নিত্য নতুন সৃজন কাজে। এ সব সৃষ্টি যখন বিস্তার লাভ করবে তখন সে শিল্পী উৎসাহে দীপ্ত হবেন এবং আরো চমৎকার কিছু সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করবেন। শিল্পীদের কাছে এ উৎসাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

কিন্তু যদি বিষয়টি এমন হয় যে, একজন লেখক একটি উত্তম লেখা তৈরী করলেন বা একজন শিল্পী একটি সুন্দর গান বানালেন কিন্তু তা কোথাও পরিবেশন করতে পারলেন না– তবে সে লেখক বা শিল্পী আরেকটি নতুন লেখা বা গান রচনার উৎসাহ পাবেন না। আবার যদি বিষয়টি এমন হয় যে, কোন একজন দরদী ব্যক্তি সে লেখাটি বই আকারে প্রকাশ করলেন বা গানটির ক্যাসেট বের করলেন কিন্তু তা বিক্রি হলো না– সে অবস্থায় ঐ ব্যক্তি এরপর এ ধরনের আর কোন উদ্যোগ নিতে সাহসী হবেন না। ফলে, শিল্পচর্চা স্তব্ধ হয়ে যাবে।

বর্তমানে আমাদের এখানে এমন অবস্থাই বিরাজ করছে। ফলে, শিল্পী সৃষ্টি হচ্ছে কম এবং উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মানগত উন্নয়ন হচ্ছেনা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য চাই ব্যাপক উদ্যোগ ও উদ্যম। সর্বস্তরের কর্মীরা যদি এ ব্যাপারে সচেতন উদ্যোগ গ্রহণ করেন তবেই কেবল এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। প্রাথমিকভাবে সৃজনশীল বই এবং ক্যাসেট সমূহ ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে সকল কর্মী সাংস্কৃতিক কাজের বিস্তৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

মনে রাখতে হবে, শিল্পীর কাজ শিল্প সৃষ্টি করা। সে শিল্প ব্যবহার ও বিকাশের দায়িত্ব যদি তাদেরই পালন করতে হয় তবে তারা শিল্প সৃষ্টি করবে কখন? তাই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে কর্মীদেরকেই। **ফুলের কাজ সৌন্দর্য ও সুবাস ছড়ানো। মানুষ যখন তা গ্রহণ করার জন্য আন্তরিক হয় তখনই কেবল সে সেই সুবাস ও সৌন্দর্য বিলাতে পারে, অন্যথায় নয়। সংস্কৃতির সৌন্দর্য ও সুবাস নেয়ার জন্যও তেমনি সবাইকে আন্তরিক হতে হবে।**

www.icsbook.info

অধ্যায়-৬

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

বাতিলের সাংস্কৃতিক হামলার লক্ষ্য

মুসলমানদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ বিনষ্ট করার লক্ষ্যে বাতিল শক্তি তার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। তারা মনে করে, দৃশ্যমান এ পৃথিবীর বাইরে আর কোন জগৎ নেই, নেই কোন জবাবদিহিতার অবকাশ।

তাই "খাও দাও ফূর্তি কর" এ ভোগবাদী দৃষ্টির বিস্তার ঘটিয়ে মুসলমানদের চিরায়ত মূল্যবোধ বিনষ্ট করে দিচ্ছে তাদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। ইন্দ্রিয় সুখ ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকে মুসলমানদের মুখ্য টার্গেটে পরিণত করছে। এর মাধ্যমে অন্যান্য মূল্যবোধের সাথে বিনষ্ট হচ্ছে:

১) আখেরাতের চেতনা। যে চেতনা মানুষকে পাপ ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত রেখে সমাজে পুত পবিত্রতার বিস্তার ঘটায়।

২) নেতৃত্বের চেতনা। যে চেতনা সামাজিক বিশৃংখলা প্রতিরোধ করে সমাজ থেকে জুলুম, অন্যায় দূর করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

৩) তাওহীদের চেতনা। এ চেতনার অভাবে মানুষের মর্যাদাবোধ বিনষ্ট হয়।

মানুষ নিজে না অন্য মানুষের প্রভু, না ভৃত্য। কিন্তু এ চেতনার বিলুপ্তি ঘটায় মানুষ কখনো অন্য মানুষের প্রভু হয়ে দাঁড়ায় আবার কখনো হয় অন্য মানুষের ভৃত্য। মানুষ একমাত্র আল্লার বান্দা এবং পরস্পর ভাই এ ধারণার বিলুপ্তি ঘটার ফলে সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। এর ফলে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব, মানুষের মর্যাদা, মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য এসব ধারণার অবলুপ্তি ঘটে এবং মানুষ পশুর স্তরে নেমে যায়।

বস্তুত: এর ফলে একজন মুসলমান তার ঈমানী চেতনা হারিয়ে ফেলে এবং সে এমন সব কাজ করতে থাকে যা একজন অমুসলমান তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না থাকার কারণে করে বসে। আর এ অবস্থা সৃষ্টি হলে মাথা গুণতিতে সে মুসলিম দলভুক্ত হলেও কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে সে আর মুসলমান থাকেনা।

"মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্যে" এ বিশ্বাসে ঘাটতি ঘটলে এবং মানুষের বাস্তব জীবনে এ ইবাদতের ধারাবাহিকতা কার্যকর না থাকলে তার মুসলমান থাকা না থাকায় কিছু যায় আসে না।

বাতিলের সাংস্কৃতিক হামলার লক্ষ্য মুসলমানদেরকে সত্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। তার মধ্যে শয়তানী গুণ বৈশিষ্ট সৃষ্টি করা। তার জীবনের উদ্দেশ্য

www.icsbook.info

থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তার জীবনকে ব্যর্থ করে দেয়া। এ ব্যর্থতা তার ইহকালকে অতিক্রম করে পরকাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। বিংশ শতাব্দীতে মুসলমানরা বাতিলের যত রকম হামলার শিকার হচ্ছে, তার মধ্যে এ সাংস্কৃতিক হামলাই তার জন্য সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও ক্ষতিকারক।

সাংস্কৃতিক হামলার মাধ্যমসমূহ

বাতিলের এ সাংস্কৃতিক হামলা সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। অসংখ্য মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এ হামলা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতার ফলে নিত্য নতুন পথ ধরে এ হামলার প্রচণ্ডতা কেবল বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হচ্ছে। সাংস্কৃতিক লেবাসে চোরাগুপ্তা হামলার অসংখ্য পথ আবিষ্কৃত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

রেডিও, টিভি, ভিসিআর, সিনেমা, নাটক, কুরুচিপূর্ণ পত্রিকা, অশ্লীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল বিনিময়, সাহিত্য, ট্যুরিজম, ভিউকার্ড, ওয়াল পোস্টার নানা মাধ্যমে এ হামলা পরিচালিত হচ্ছে।

এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান মালা, নারী স্বাধীনতার মোহময় শ্লোগানের আড়ালে অবাধ মেলামেশাপূর্ণ সামাজিকতা, বিউটি পার্লার, শিরক মিশ্রিত গৃহ সজ্জা সামগ্রীর বিস্তার, সিনে ও পর্ণো ম্যাগাজিন, সামাজিক অনুষ্ঠানমালায় ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী পরিবেশ বিস্তার, পোশাক, নিত্য নতুন বিলাস সামগ্রী উদ্ভাবন, শিকার, উৎসব ও মেলা, সকল প্রকার প্রচার, যোগাযোগ ও গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে বাতিল শক্তি তার সর্বগ্রাসী সাংস্কৃতিক হামলা পরিচালনা করছে। এমনকি অর্থনৈতিক অনুদান বা ঋণ, শিল্প ও কারিগরী চুক্তি, কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্য দিয়েও অপসংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে কার্পণ্য করে না বাতিল শক্তি।

বিশ্ব রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বাতিল শক্তির প্রাধান্য থাকায় সকল প্রকার যোগাযোগ ও মেলামেশার মধ্য দিয়েই বাতিল শক্তি অপসংস্কৃতি বিস্তারে তৎপর। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে মুসলমানরা দূর্বল থাকার কারণে খুব সহজেই মুসলমানরা বাতিলের সাংস্কৃতিক বশ্যতা স্বীকারও করে নেয়।

বাতিলের এসব সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও হামলা মুসলমানদের ঈমানী চেতনা কিভাবে ও কতটা ধ্বংস করছে তার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ দ্বীনের প্রতি সামান্য মোহব্বত পোষণকারী যে কোন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছে এ হামলার বিরূপতা। যাদের মধ্যে ঈমানের সামান্যতম স্ফুলিংগও বর্তমান তারাই বেদনাদীর্ণ চিত্তে এ অবস্থা অবলোকন করে শিউরে উঠতে বাধ্য। এ অবস্থায় একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন বেগবান করা ছাড়া মুসলমানদের বিশ্বব্যাপী পতন ঠেকানোর আর কোন বিকল্প রাস্তা নেই। বিশ্বব্যাপী যে ইসলামী আন্দোলন চলছে তার সফলতার জন্য এ সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনা করা আজ সময়ের দাবী।

www.icsbook.info

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পরিণতি

বাতিলের সর্বপ্লাবী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে মুসলমানরা যে একটি মর্যাদাবান জাতি, তাদের রয়েছে আলাদা কৃষ্টি-কালচার-ঐতিহ্য, বিশ্ব মানবতার নেতৃত্বদানের জন্য এবং মহত্ব ও মানবতার বিজয় ঘোষণার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, এ কথা অধিকাংশ মুসলমান আজ বিস্মৃত। বলা হয়ে থাকে, পৃথিবীতে এখন শতকোটি মুসলমানের বাস। কিন্তু যে অর্থে একজন মানুষ মুসলমান হয় সে দায়িত্ববোধসম্পন্ন মুসলমান এর মধ্যে কয়জন? যে কেউ এ কথা স্বীকার করবেন যে, এ সংখ্যা নেহায়েতই নগন্য।

বাতিলের সাংস্কৃতিক ঘুমপাড়ানি গান মুসলমানদের এতটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, তাদের ঘর জুড়ে দাউ দাউ আগুন দেখেও সে আগুন নেভাতে যে তাদের উঠে দাঁড়াতে হবে সে কথা বুঝতে পারছে না অধিকাংশ মুসলিম। শতাব্দীর কাল ঘুমে বিভোর ওরা। ওদের সামনে যে নতুন শতাব্দীর সূর্যোদয় ঘটেছে এবং দেশে দেশে যুগের মুয়াজ্জিন আযান হেঁকে চলেছে– নিদ্রাতুর জাতির খুব কম লোকই সে আযানের ধ্বনি শুনছে।

সাংস্কৃতিক হামলা অন্য যে কোন হামলার চেয়ে ক্ষতিকর

আজকে একথা প্রমাণিত সত্য যে, সাংস্কৃতিক হামলা বাতিলের অন্য যে কোন হামলার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর ও মারাত্মক। এ হামলার ফলে বিশ্বব্যাপী একশ' কোটি মুসলমানের অধিকাংশই আর বিশ্বাস ও কর্মে মুসলমান হিসাবে সক্রিয় নেই। বাতিলের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সাফল্য এখানেই। একটি জীবন্ত জাতিকে ওরা ঘুমন্ত জাতিতে পরিণত করেছে এ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে। বাতিল শক্তি শতকোটি মুসলমানের অস্তিত্বে ততটা ভীত নয় যতটা ভীত গুটিকয় স্পীরিচুয়াল মুসলমানের তৎপরতায়। এ গুটিকয় মুসলমানকেই ওরা চিহ্নিত করে মৌলবাদী বলে।

উপরে যে ক্ষতির উল্লেখ করলাম প্রকৃত ক্ষতির তুলনায় এ ক্ষতি খুবই সামান্য। সাংস্কৃতিক হামলার অর্ন্তনিহিত ক্ষতির দিকটা একবার প্রত্যক্ষ করলে এর ভয়াবহতা দেখে যে কোন মুসলমান শিউরে উঠবে।

আমরা জানি বাতিলের সশস্ত্র হামলায় একজন মুসলমান জীবন দিলে ইসলাম তাকে শহীদের মর্যাদা দেয়। শহীদদের জন্যে রয়েছে আল্লাহর দরবারে বিশেষ মর্যাদা ও জান্নাত। আল্লাহর সন্তোষ লাভের মাধ্যমে জান্নাত প্রাপ্তিই একজন মুসলমানের জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য বলে বিবেচিত হয়। এদিক থেকে বাতিলের প্রত্যক্ষ আঘাতের কারণে দুনিয়ার জীবনে সে পরাজিত হওয়ার পরও তার জীবন

www.icsbook.info

ব্যর্থ হয়ে যায় না। বরং এ ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই সে লাভ করে তার জীবনের চূড়ান্ত সফলতা। ফলে তার দুনিয়ার জীবনের পরাজয়ই হয়ে ওঠে তার চূড়ান্ত সফলতার সোপান।

অপরদিকে বাতিলের সাংস্কৃতিক হামলার কারণে প্রতিদিন হাজার হাজার মুসলমান তার মুসলমানিত্ব হারাচ্ছে– মৃত্যু ঘটছে তাদের ঈমানী চেতনার। দুনিয়ার আদম শুমারিতে তাদেরকে মুসলমান হিসাবে উল্লেখ করা হলেও আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য হারাচ্ছে তারা। হালাল হারামের কোন বাঁধন তাঁদেরকে পরিচালিত করে না। পাপ পূণ্যের ধার ধারে না বাস্তব কর্ম জীবনে এ সকল মুসলমান। আল্লাহর ফরমাবরদারীর পরিবর্তে নাফরমানিতে লিপ্ত হতে এসব মুসলমানরা মোটেই ভয় পায় না। আল্লাহর আদেশগুলো যেমন তারা অমান্য করে তেমনি নিষেধগুলো মেনে চলারও কোন প্রবণতা তাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট থাকে না। এ ধরনের মানুষদের জন্যই আল্লাহ পরকালে জাহান্নামের কঠিন আজাবের ভয় দেখিয়েছেন। কোরআনে বার বার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন: 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।'

অথচ সাংস্কৃতিক হামলার শিকার ঈমনদারদের মৃত্যু ঘটে মুসলমানিত্বহীন অবস্থায়। অর্থাৎ সশস্ত্র হামলার শিকার মুসলমান ব্যক্তির জীবন যেখানে চূড়ান্ত অর্থে প্রকৃত সাফল্য লাভ করে সেখানে সাংস্কৃতিক হামলার শিকার মুসলমানের জীবন চূড়ান্ত অর্থেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ জন্যই সাংস্কৃতিক হামলা মুসলমানদের জন্য অন্য সকল হামলার চেয়ে অধিক মারাত্মক ও ক্ষতিকারক।

মুসলমানদের সাংস্কৃতিক পরাজয় তাদেরকে আরো একটি ক্ষতির সম্মুখীন করে। সেটি হলো আল্লাহর অতিরিক্ত ক্রোধ তাদের ইহ ও পরকালীন জীবনে আপতিত হওয়া। একজন মনিব তার দুই বান্দাকে একটি কাজের ভার দিল। এদের একজন কিভাবে কাজটি করতে হয় তা জানে না এবং এ কাজটি করতে না পারলে মনিব কতটা রাগান্বিত হবে সে সম্পর্কেও তার কোন ধারণা নেই। অপর জন জানে কাজটি কিভাবে করতে হয় এবং এও জানে এ কাজ না করলে তার মনিব কতটা রাগান্বিত হবে। এদের দু'জনই যদি কাজটি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে প্রথমোক্ত জনের চাইতে দ্বিতীয় জনের ব্যর্থতায় মনিব অধিক রাগান্বিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। ঠিক তদ্রূপ মুসলমান জানে এ দুনিয়ায় তার কর্তব্য কি এবং এ কর্তব্য না করলে তার পরিণতি কি হতে পারে। অমুসলমান এ ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা রাখে না। ফলে, দ্বীনের দাবি পূরণ না করার কারণে আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি অধিক রুষ্ট হন এবং এ কারণে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করেন এবং পরকালীন জীবনে তারা অধিক কঠোর শাস্তি পাওয়ার হকদার হয়ে যায়।

www.icsbook.info

কতিপয় সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র ও তার প্রতিকার

সম্প্রতি একজন বৃটিশ লেখক ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিকাশ ও অগ্রগতি লক্ষ্য করে এর প্রতিরোধের জন্য পশ্চিমা সরকারগুলোর কাছে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করে একটি বই বাজারজাত করেছেন। বইটিতে কিভাবে ইসলামের এ অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করে দেয়া যায় সে সম্পর্কে যে প্রস্তাবগুলো পেশ করা হয়েছে মুসলমানদের উচিত তা খুব গভীরভাবে অধ্যয়ন করা এবং সে পরিকল্পনার বিপরীত কর্মধারা জোরদার করা। উক্ত লেখক যে প্রস্তাবগুলো পেশ করেছেন তা উল্লেখ করে এর মোকাবেলায় মুসলমানদের করণীয় কি হতে পারে এখানে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

প্রস্তাব-১: *আরব, পারস্য এবং তুর্কীদের মাঝে জাতীয় পর্যায়ে অনৈক্য ও বিবাদ তৈরীর মাধ্যমে উপদল বানাতে হবে এবং শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন প্রজ্জলিত রাখতে হবে।*

করণীয়: এ প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য হলো মুসলামানদের পরস্পরের মধ্যে সর্ব পর্যায়ে অনৈক্য ও বিরোধ সৃষ্টি করা। তাই সর্ব পর্যায়ে অনৈক্য ও বিরোধে সৃষ্টির এ পায়তারা রুখতে হবে। এ ধরনের পাতা ফাঁদে পা দেয়া যাবে না। সর্ব পর্যায়ে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার জন্য সকলের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটাতে হবে, সহনশীল হতে হবে। কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে আবেগ দিয়ে নয় বরং তার মোকাবেলা করতে হবে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি দিয়ে। "মুসলমানরা একটি মাত্র মিল্লাত এবং তারা পরস্পর ভাই" -এ উপলব্ধি যত বেশী বিস্তারিত হবে ততই কমে যাবে এ সমস্যা। এর জন্য প্রয়োজন অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করার মানসিকতা সাধারণ ভাবে সকলের মধ্যে সৃষ্টি করা।

প্রস্তাব-২: *পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে হবে। মুসলিম দেশগুলোতে মার্কিন, বৃটিশ, ফরাসী এবং ইটালিয়ান চলচ্চিত্রের পরিবেশনা বাড়াতে হবে। এটি খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে। কারন, দেখা গেছে, আফগানিস্তানের মত দরিদ্র দেশের জনগণ যেখানে ঠিকমত খেতে পায় না সেখানেও অশ্লীল চলচ্চিত্র জনপ্রিয়। মুসলমানদের প্রকৃত পরিচয় মুছে ফেলার এটি একটি কৌশল।*

করণীয়: পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় অশ্লীল চলচ্চিত্রের পরিবেশনা বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলোন গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে জোর প্রচারণা চালাতে হবে। প্রতিবাদের সকল ভাষা (মিটিং, মিছিল, বিবৃতি, পত্রিকারর চিঠিপত্র কলামে লেখা, নিবন্ধ-প্রবন্ধ লেখাসহ) ব্যবহার করতে হবে। মুসলমানদের ঈমান

www.icsbook.info

আকিদা ধ্বংসকারী সকল অশ্লীল ছবি বন্ধের জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, স্যাটালাইট মিডিয়াগুলো চালু করার পেছনে এ ষড়যন্ত্রই কাজ করছে। তাই এর পাশাপাশি এর বিকল্প চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিবেশনার ব্যবস্থা করতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামের সাংস্কৃতিক বিনিময় বাড়াতে হবে।

প্রস্তাব-৩: পশ্চিমাপন্থী আলেমদের সমর্থন জোগাতে হবে।

করণীয়: এ ধরনের আলেমদের মুখোশ উন্মোচন করে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। সামাজিকভাবে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির বিনাশ ঘটাতে হবে। জনগণের সামনে ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরতে হবে বেশী বেশী করে। ইসলামের সত্যিকার রূপ দেখতে পেলে জনগণই তাদের বয়কট করবে।

প্রস্তাব-৪: মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যগুলো প্রকট করে তুলতে হবে। বিশেষ করে সিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে।

করণীয়: সিয়া ও সুন্নী সহ বিভিন্ন ফেরকার মুসলমানদের প্রত্যেকেই এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তারা সবাই মুসলমান। এ কথা স্মরণ রেখে পরস্পরের মধ্যে সহমর্মিতা বাড়াতে হবে। প্রত্যেককে নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী দ্বীনি আমল করার পরিবেশ দিতে হবে। কোরআন ও সুন্নাহর মৌলিক শিক্ষার আলোকে পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে শত্রুর পাতা ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সকল মহলকে সচেষ্ট হতে হবে।

প্রস্তাব-৫: অমুসলিমদেরকে মুসলিম দেশগুলোতে অভিবাসিত করতে হবে এবং বিপরীত প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে।

করণীয়: এ প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করা কঠিন। সে জন্য এ প্রক্রিয়ার আওতায় যে উদ্দেশ্যে ওরা এ অভিবাসিত করবে সে উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিতে হবে ঈমানী দৃঢ়তায়। মুসলমানদের চারিত্রিক দৃঢ়তা এমন পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে যেন অমুসলিমরাই এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের পথে চলে আসে। স্মরণ রাখতে হবে যেন এ প্রক্রিয়া বুমেরাং হয়ে তাদেরকেই আঘাত হানে।

প্রস্তাব-৬: আরবী ভাষাকে মোকাবেলা করতে হবে।

করণীয়: বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানদেরকে আরবী ভাষা চর্চা বাড়াতে হবে। কারণ ইসলামের মূল শিক্ষা অনুধাবন করার জন্য এবং মুসলিম হিসেবে জীন্দেগী যাপনের জন্য আরবী ভাষা জানা অতীব জরুরী। আরবী ভাষা শেখা ছাড়া কোরআন তেলাওয়াত ও তার মর্ম উদ্ধার, নামায রোযা সহ ইসলামের মৌলিক এবাদত সম্পন্ন করাও সম্ভব নয়।

www.icsbook.info

প্রস্তাব-৭: পাশ্চাত্যপন্থী নয় এমন মুসলিম দেশে চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

করণীয়: রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায় ছাড়াও এ ধরনের আন্তর্জাতিক ফোরাম গড়ে তুলতে হবে। মুসলিম বিজ্ঞানী, আলেম, বুদ্ধিজীবি, কবি সাহিত্যিক, শিল্পীদের আন্তর্জাতিক ফোরাম গড়ে তুলে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বাড়াতে হবে। তাদের মধ্যে বিনিময় সফর বাড়াতে হবে এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিম ঐক্য প্রক্রিয়া জোরদার করে এ চাপের মোকাবেলা করতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে ইসলামী জাতিসংঘ গঠনের দাবী উঠেছে তা এই কল্যাণ চিন্তা থেকেই উদ্ভূত। মুসলিম দেশগুলোতে এ দাবী ক্রমান্বয়ে ব্যপকতর করে তুলতে হবে এবং ওআইসি, রাবেতা, ইফসুর মত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সর্বাবস্থায় ইসলামী নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

প্রস্তাব-৮: মুসলিম দেশে পশ্চিমাধাঁচের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

করণীয়: ইসলামী আন্দোলন জোরদার করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সফল করার চেষ্টা চালাতে হবে।

প্রস্তাব-৯: মুসলিম দেশগুলোর যুবকদের চরিত্র নষ্ট করার জন্য সেখানে জুয়ার আড্ডা ও অন্যান্য পাপাচারের পথকে অবশ্যই খোলা রাখতে হবে।

করণীয়: মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ সহ সকল অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে পাপাচারের সকল পথ অবরুদ্ধ করে দিতে হবে। প্রাথমিকভাবে যেখানে যতটুকু সম্ভব সেখানে সেটুকু দিয়েই এ অবরুদ্ধতার কার্যক্রম শুরু করতে হবে। কোন অবস্থাতেই পাপের রাস্তা বিস্তারের প্রচেষ্টাকে চ্যালেঞ্জহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া যেতে পারে না।

www.icsbook.info

অধ্যায় – ৭

ইসলামের সাংস্কৃতিক কর্মসূচী

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চায় পরিবার প্রথা

পরিবার হচ্ছে মানব সমাজের প্রাথমিক ইউনিট। মানব সভ্যতার প্রধান লালন ক্ষেত্র হচ্ছে এই পরিবার। পাশ্চাত্যের দর্শন ও শিক্ষা এই পরিবার প্রথার ওপর আঘাত হেনে সভ্যতার মূল ভিতকেই বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ফলে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে প্রতিনিয়ত। পাশ্চাত্যে অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, সেখানকার নারী পুরুষ এখন "লিভটুগেদার সিস্টেমে" জীবন নির্বাহ করতেই ক্রমাগত অভ্যস্ত হচ্ছে। এ ব্যবস্থার কুফল এই যে, এতে করে প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ সহ অত্যাবশ্যকীয় মানবীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ সংকুচিত হচ্ছে।

প্রেমহীন এক সমাজে বেড়ে উঠছে আগামী দিনের বিশ্ব নাগরিক সম্প্রদায়। যার অনিবার্য পরিণতিতে সমাজে হিংস্রতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য যা পশুর পশুত্বকেও হার মানাবে।

ইসলাম পরিবারকে সংস্কৃতি চর্চার নিয়ামকে পরিণত করে যে অতুলনীয় বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তার কোন বিকল্প নেই। মানব সমাজের প্রাথমিক শিক্ষা, আদব কায়দা আত্মস্থ করা, 'স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধাবোধ' সমন্বিত সুষম জীবনধারার প্রচলন, কল্যাণকর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য এই পরিবার পদ্ধতি সব সময়ই অতিশয় কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, পারিবারিক পর্যায়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আদায় ও ক্ষতিকর কর্মধারা থেকে তার সদস্যদের সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ যতটা সহজ তেমনটি অন্য কোন ভাবে সম্ভব নয়। পারিবারিক পর্যায়ের শাসন ও তদারকি যত বৃদ্ধি পাবে সমাজে অপরাধপ্রবণতা তত কমে আসবে। পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধের ধারণা থেকেই মানবতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের ধারণা বিস্তৃত হয়। এভাবেই মানব সভ্যতা এগিয়ে যায়। এমনকি এমন কিছু বিষয় আছে পারিবারিক তদারকি ছাড়া যার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় বলে যেখানে পরিবার প্রথার গুরুত্বকে খাটো করে দেখা হয় সেখানেই মানবতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

মসজিদ ভিত্তিক সংস্কৃতি চর্চা

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার দ্বিতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে মসজিদ। শুধু সংস্কৃতি চর্চা কেন, মসজিদ ইসলামী সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প চর্চার যেমন প্রাণকেন্দ্র তেমনি মসজিদ মুসলমানদের রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থারও কেন্দ্রভূমি।

www.icsbook.info

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা যে অভিন্ন সাংস্কৃতিক বোধে উজ্জীবিত হয় মুসলমানদের জীবনধারা সে বোধের দ্বারাই পরিচালিত হয়। আমাদের সমাজে মসজিদকে এখনো যথার্থ মর্যাদায় ব্যবহার করার মানসিকতা তৈরী হয়নি। এ মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটাতে হবে। মসজিদকে ব্যবহার করতে হবে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প চর্চার কেন্দ্ররূপে। মসজিদে নিম্নরূপ কর্মসূচী চালু করা যেতে পারে।

১) প্রত্যেক নামাযের পর বা অন্তত: নির্ধারিত ওয়াক্তের নামাযের পর ৫/১০ মিনিট কোরআন ও হাদীসের পাঠ ও আলোচনা হতে পারে।
২) জুময়ার আরবী খোতবার আগে বাংলায় ইসলামী জীবন পদ্ধতি নিয়ে বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৩) বিভিন্ন ইসলামী দিবসে ইসলামের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা সভা ও মাহফিলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৪) বিভিন্ন ইসলামী দিবসে শিশু কিশোর, যুবক ও বয়স্কদের জন্য আলাদা আলাদা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে।
৫) আযান, কেরাত, হামদ-নাত-এর মাহফিল বা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।
৬) প্রতিটি মসজিদে ইসলামী পাঠাগার চালু করা যেতে পারে। সারাদিন বা কমপক্ষে আসর থেকে এশা পর্যন্ত এসব পাঠাগারের বই মসজিদে বসে পড়ার বা মসজিদ থেকে বাইরে নিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৭) জুময়া বার বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও মাহফিলের সময় ইসলামী সাহিত্য বা শিল্পকলার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৮) লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন বয়স ও পর্যায়ের ব্যক্তিদের জন্য গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা শুরু করা যেতে পারে।
৯) মাসয়ালা মাসায়েল ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং শিশুদের জন্য কোরআন হাদীস শেখার ব্যবস্থা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
১০) রমজানে সেহেরীর জন্য ডাকা এবং হামদ-নাত পরিবেশন করা যেতে পারে।

এভাবে শিশু, যুবক ও বয়স্কদেরকে ব্যাপকভাবে মসজিদমুখী করার উদ্যোগ নিতে হবে। মসজিদ কেবল নামায পড়ার জায়গা নয়, মানুষের অবসর ও বিনোদনের কেন্দ্র রূপেও মসজিদকে গড়ে তুলতে হবে।

এভাবে স্বল্প পরিশ্রম ও অল্প ব্যয়ে মসজিদকে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র রূপে গড়ে তুললে মানুষের মিলনক্ষেত্র মসজিদ হতে পারে সকলের জন্য আশির্বাদ স্বরূপ। মসজিদভিত্তিক সাংস্কৃতিক তৎপরতা চালুর জন্য অল্প পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন অথচ এ দিয়ে কার্যকরভাবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

www.icsbook.info

রেডিও টিভি

আধুনিক বিশ্বে রেডিও এবং টিভি খুবই শক্তিশালী গণমাধ্যম। রেডিও এবং টিভিতে ইসলামী অনুষ্ঠানমালা বাড়ানোর লক্ষ্যে এ দুটো প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানমালা যারা তৈরী করেন তাদের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। তারা যেন ইসলাম ও নীতি গঠনমূলক কর্মসূচী বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন সেভাবে তাদের কাছে এসব অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানমালার খসড়া এবং শিল্পী সরবরাহ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত: এ দুটো প্রতিষ্ঠানকে সেই সব লোকদের কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নিতে হবে যারা ইসলাম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখেন এবং এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনারও যোগ্যতা রাখেন। এ ধরনের লোক যত বেশী এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে একীভুত হবেন ততই এসব প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানমালাকে ইসলামীকিকরণ সম্ভব হবে।

তৃতীয়ত: এসব প্রতিষ্ঠান থেকে কখনো ইসলাম বিরোধী কোন অনুষ্ঠান প্রচারিত হলে সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে। সরাসরি তাদের কাছে প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করতে হবে যেন তারা বুঝতে পারে যে, সত্যি ব্যাপক সংখ্যক জনমত এ ধরনের অনুষ্ঠান অপছন্দ করে। পত্র পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে লিখতে হবে এবং প্রয়োজনে সভা-সমাবেশ ও মিছিলের ভাষাও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সরকার পরিচালিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, নজরুল ইনস্টিটিউট, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন সহ সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর তৎপরতা অবশ্যই এ দেশের অধিকাংশ জনগণের বিশ্বাস ও চেতনার স্বপক্ষে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এসব প্রতিষ্ঠান এমন সব ব্যক্তিরা পরিচালনা করছেন যাদের অনেকেরই জাতির প্রতি কোন কমিটমেন্ট নেই– শুধু চাকরীর জন্য চাকরী করা। আবার এসব প্রতিষ্ঠানে এমন কিছু ব্যক্তিবর্গও আছেন যারা জাতিসত্তা বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতেই অধিক ভালবাসেন।

জনগণের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠানকে জনকল্যাণমূখী করতে হলে এ পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হবে। যোগ্যতা সম্পন্ন কমিটেড লোকদের উচিত এসব প্রতিষ্ঠানের কর্ম তৎপরতার সাথে যত বেশী সম্ভব নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা। নিজেদের কর্মক্ষেত্র বাছাই করার সময় এদিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া প্রয়োজন শুদ্ধস্বর নবীন প্রজন্মকে। আর এসব প্রতিষ্ঠানে যারা কর্মরত আছেন জাতির প্রতি

www.icsbook.info

তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তাদেরকে সে সম্পর্কে সচেতন করে তোলা দরকার। এর পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলাম ও জাতিসত্ত্বা বিরোধী কোন কার্যক্রম চালু হলে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করা প্রতিটি দেশপ্রেমিক ও ঈমানদার ব্যক্তির জাতীয় ও ঈমানী দায়িত্ব।

চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র এদেশের একটি উল্লেখযোগ্য গণমাধ্যম। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক রাজধানীসহ সারাদেশ ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য সিনেমা হলগুলোতে ভীড় জমায়। তারা নিজের গাটের পয়সা খরচ করে কেবল যে কিছু বিনোদন ও আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরে বিষয়টি মোটেই তেমন নয়। তারা এ আনন্দের পাশাপাশি একটি সাংস্কৃতিক বোধ ও মানসিকতা সাথে নিয়েই প্রেক্ষাগৃহ থেকে বের হয়। এ বোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামের অনুকূল হয় না। প্রযোজক ও পরিচালকগণ বাণিজ্যিক লোভের কারণে শিল্প বোধ সম্পন্ন ছবির চাইতে পোশাকী ছবি নির্মাণে অধিক আগ্রহী হয়– যার ফলে নগ্নতা ও বেহায়াপনার প্রতি তারা অধিক ঝুঁকে পড়ে।

যারা এ সিনেমা দেখে তাদের শতকরা আশিজন অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষ। এদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর জন্য চলচ্চিত্রের মাধ্যমটিই অধিক ফলপ্রসূ। এ জন্য দাওয়াতে দ্বীনের কাজে এ মাধ্যমটির ব্যবহার করতে হলে দ্বিবিধি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এক, কোন প্রতিষ্ঠানকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে ছবি নির্মাণের জন্য নিজস্ব উদ্যোগ নিয়ে ময়দানে আসতে হবে। এটি একটি জটিল ও ব্যয় বহুল উদ্যোগ। নিজস্ব স্ক্রীপ্ট রাইটার থেকে শুরু করে প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশীল সমেত একটি পূর্ণাঙ্গ সেট নির্মাণ শুধু ব্যয় সাপেক্ষই নয়– সময় সাপেক্ষও। কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসলে তাদেরকে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েই এগিয়ে আসতে হবে এবং তা সম্ভব হলে তা খুবই ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

দ্বিতীয়ত: বর্তমানে যারা বাণিজ্যিক ছবি করছেন তাদেরকে ঐতিহাসিক ইসলামী ছবি করার জন্য অনুপ্রাণিত করা। এ কাজে তাদের সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদান করা। তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তি সাপোর্ট, শিল্পী ও কলাকুশলীর সেট বর্তমান থাকায় তুলনামূলকভাবে স্বল্প ব্যয়ে ভাল ছবি পাওয়া সম্ভব। প্রাথমিকভাবে সিরাজদৌলা বা দি সোর্ড অব টিপু সুলতানের মত ইতিহাস ভিত্তিক ছবি হলে এসব ব্যবসায়ীরা ব্যবসা এবং জাতির সেবা দুটোই একসাথে চালিয়ে যেতে সক্ষম হবেন বলে আমার ধারণা। প্রযোজক, পরিচালকদের এদিকে উদ্বুদ্ধ করা দরকার।

www.icsbook.info

নাটক

নাটক আরেকটি জনপ্রিয় গণমাধ্যম। প্রধানত: উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা এর দর্শক। দরিদ্রদেরও নাটক দেখার আগ্রহ আছে, তবে নাটকের জন্য পয়সা খরচ করার মানসিকতা তাদের মধ্যে এখনো গড়ে ওঠেনি। মঞ্চ নাটক ছাড়াও অডিও এবং ভিডিও নাটক এবং রেডিও টিভির নাটকও এদেশে খুবই জনপ্রিয়। নাটকের মাধ্যমেও ইসলামী সংস্কৃতি জনপ্রিয় করা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই কিছু সীমাবদ্ধতার শিকার হতে হয়। নারী-পুরুষের একত্রে অভিনয় ইসলামী শরিয়ত গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে না। এতে পর্দার ব্যাঘাত ঘটে। অভিনয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনেও ইসলামের কিছু বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য ওলামা ও নাট্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করে তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

সমাজ পরিবর্তনের মূখ্য নিয়ামক শক্তি মধ্যবিত্ত সমাজ। তাদের মানসিক বিবর্তনের জন্য নাটক খুবই জরুরী। মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিকতা যতবেশী ইসলামের কাছাকাছি হবে ইসলামী সমাজ নির্মাণের কাজ ততই গতিশীল হবে। এজন্য ইসলামী সমাজ নির্মাণের স্বপ্নে যারা বিভোর নাটকের বিষয়টিও তাদের গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে। ইসলামী নাটক রচনা ও মঞ্চায়নের ব্যাপারেও তাদের উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

সাহিত্য

আধুনিক বিশ্বে মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বোধ সৃষ্টিতে সবচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে যে মাধ্যমটি তার নাম সাহিত্য। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ছড়া এসব নানা রকম ফর্মে সাহিত্য চর্চা চলে। শিক্ষিত মানুষ মাত্রই সাহিত্যের কোন না কোন ফর্মের প্রতি আগ্রহ পোষণ করবে এবং সাহিত্য পড়বে এটাই স্বাভাবিক। এভাবে পড়ার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দ্বারাই তার জীবনবোধ গড়ে ওঠে। ফলে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হলে ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। এজন্য ইসলামী সমাজ নির্মাণে আগ্রহী সকলকে ইসলামী সাহিত্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সার্বক্ষণিক সচেষ্ট থাকতে হবে। ইসলামী সাহিত্যের চাহিদা যত বাড়বে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে লেখকরা ততবেশী আগ্রহী ও সচেষ্ট হবে।

ব্যক্তিগতভাবে বই সংগ্রহ, বই উপহার প্রদান, বই ক্রয়ে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সহায়তা করা, স্কুল কলেজ মসজিদ পাঠাগার সহ সকল ধরনের পাঠাগার বৃদ্ধি ও তাতে নিয়মিত বই পত্রের ব্যবস্থা করা, কোরআন হাদীসের পাশাপাশি সৃজনশীল

www.icsbook.info

ইসলামী সাহিত্য দ্বারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল লাইব্রেরী সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে সমাজে ইসলামী সাহিত্য পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করা, গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা চালু করা, সৃজনশীল ইসলামী সাহিত্য বিক্রির জন্য সপ্তাহ পালন, গ্রুপ ভিত্তিক ইসলামী সাহিত্য বিক্রির পদক্ষেপ নেয়া– এ ধরনের নানাবিধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ ক্ষেত্রের ঘাটতি পূরণের জন্য সচেষ্ট হওয়া যেতে পারে। নিয়মিত মাসিক বাজেটে চাল-ডালের মত বই ক্রয়েরও একটি পরিকল্পনা করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। কারণ চাল ডাল আমাদের দেহের ক্ষুধা মেটায় আর বই মেটায় আমাদের মনের ক্ষুধা।

সংগীত

সংগীত পছন্দ করে সকল শ্রেণীর মানুষ। সুখে দুঃখে, আনন্দে বেদনায়, সংগ্রামে সংঘাতে, সকল অবস্থায় সংগীত সমভাবে মানুষকে আকর্ষণ করে। সংগীত মানুষকে আবেগে উদ্বেলিত করে, সংগ্রামে উদ্যমী করে। সঙ্গীত চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে জাগিয়ে তোলে মানুষকে। মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বোধ জাগাতে সঙ্গীতের ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য। হামদ, নাত ও ইসলামী সঙ্গীতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং অডিও ভিডিও ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে। তাই যারা ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের কাজে নিয়োজিত ইসলামী সঙ্গীতের প্রসারেও তাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

চারু ও কারুকলার বিস্তার

মানুষ স্বভাবতঃই সৌন্দর্য প্রিয়। এজন্যই মানুষ শিল্পের প্রতি আসক্ত। মানুষের এই শিল্প চেতনা যেন কল্যাণকর পথে অগ্রসর হয় সে জন্যই ইসলামী চারু ও কারু কলার বিস্তার ঘটানো প্রয়োজন। একজন মানুষের ঘরে প্রবেশ করলে বুঝা যায় লোকটি কোন প্রকৃতির। তার পছন্দ-অপছন্দ, ভাললাগা-মন্দলাগার পরশ পাওয়া যায় তাতে। কেউ ঘর সাজায় মেডোনার ছবি দিয়ে, কেউ রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি দিয়ে, আবার কেউ সাজায় ফুলশোভায়, কেউ কেউ ক্যালিগ্রাফীতে। কারো টেবিলে থাকে বিদেশী পিনআপ ম্যাগাজিন, কারো টেবিলে রুচিশীল সাহিত্য ভাণ্ডার। এভাবে প্রতিটি মানুষ সচেতন বা অবচেতনভাবে চারু ও কারু কলার শিল্পবোধ দ্বারা তাড়িত। কেউ এসবের চর্চা করে, কেউবা ভোগ করে।

চারু ও কারু শিল্পে ইসলামের ছোঁয়া থাকলে মানুষ অশ্লীলতা থেকে এবং এমনকি প্রচ্ছন্ন শিরক থেকে রক্ষা পেতে পারে। সামাজিকভাবে ইসলামী আবহ সৃষ্টির জন্য তাই চারু ও কারু শিল্পের ব্যাপক চর্চা হওয়া প্রয়োজন।

www.icsbook.info

শিল্পী-সাহিত্যিকদের সহায়তা

শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীগণ যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে এদেরই সঠিক দিক নির্দেশনার ওপর। এরা মানুষকে দেয় আশা ও আশ্বাস, প্রেরণা যোগায় যে কোন কঠিন মুহূর্তে। নিবেদিত প্রাণ এসব শিল্পীরা সাধারণভাবে নির্লোভ ও বিষয়বুদ্ধিতে দুর্বল। বিড়ম্বনার পর বিড়ম্বনার মোকাবেলা করতে হয় তাদের। সমাজের বঞ্চনা, গৃহের গঞ্জনা, মানুষের অবজ্ঞা, অবহেলা ও তিরস্কার সহ নানাবিধ জটিলতার মধ্য দিয়েও এরা সমাজের জন্য তাদের সৃষ্টিকে উপহার দিয়ে যায় কেবলমাত্র প্রাণের তাগিদে। আবার অনেকে সে সুযোগটুকুও পায় না। ফুল ফোটাতে গিয়ে অকালেই ঝরে যায়।

কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা সমাজদেহের চক্ষু, সভ্যতার বাগান। সমাজ পরিচালকরা সে বাগানের মালি। তারা যত বেশী এ বাগানের পরিচর্যা করবেন সমাজে তত বেশী হৃদয়ের পুষ্প ফুটবে। যে জনগোষ্ঠী এ বাগানের পরিচর্যায় অমনোযোগী হবে তারা বঞ্চিত হবে মানবতার পুষ্প সৌরভ থেকে।

ফুল যেমন নিজের সৌরভ ও সৌন্দর্য বিলিয়ে আনন্দ পায়, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবিরাও তেমনি আপনার সৃষ্টি জগতে দিয়ে আনন্দ পায়। কিন্তু এ দেয়াটা নির্ভর করে নেয়ার ওপর। যারা তাদের কাছে চাইবে এবং যেমনটি চাইবে তারা তেমনটিই উপহার দিবে। সে জন্য **একটি কল্যাণময় ইসলামী সমাজ যাদের কাম্য– তাদের উচিত, কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা দান করা।** এ পৃষ্ঠপোষকতা তারা যতবেশী দিতে পারবে ততই ইসলামী সমাজের অনুকূলে তাদের সৃষ্টি বৈচিত্রের বিকাশ ঘটবে।

এ ক্ষেত্রে মহানবীর সেই হাদীস আমাদের বারবার স্মরণ করা দরকার, কবি-সাহিত্যিকদের সহায়তা করার জন্য সমাজের মানুষকে যে বানী প্রেরণা যুগিয়েছে। **মহানবী বলেছেন: কবিদের আর্থিক সহায়তা দান করা পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সমতুল্য।**

পৃথিবীর প্রতিটি মানস পরিবর্তনে এ সত্যটি বার বার প্রমাণিত হয়েছে। মূখ্যত: পরিবর্তন ঘটিয়েছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিন্তু তার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সংস্কৃতি কর্মীরা। **সাংস্কৃতিক কর্মীরা হচ্ছে যুগের মুয়াজ্জিন আর রাজনৈতিক নেতারা ইমাম। আধুনিক বিশ্বে যুগের নকীবদের মুসলমানরা যতক্ষণ পর্যন্ত ময়দানে না পাঠাতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত লাব্বাইক লাব্বাইক বলে ঘর থেকে ছুটে আসবে না মুসল্লিরা। জনগণ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে না কোন ইমামের পিছনে– ইসলামী বিপ্লব সাধন সেখানে সম্ভব হবে না।** এ জন্যই সংস্কৃতি কর্মীদের ব্যাপকভাবে ময়দানে নামানো আজ অত্যাবশ্যক। আর তাদের

www.icsbook.info

ময়দানে নামাতে হলে দরকার উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার। তাই শিল্পীদের সার্বিক সহায়তা দানের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক কিন্তু সুস্পষ্ট ও সুষম পরিকল্পনা দরকার। এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, এ পৃষ্ঠপোষকতা কেবল ভাবাবেগ তাড়িত না হয়। পানি না দিয়ে অধিক সার দিলে যেমন বৃক্ষ মারা যায়, তেমনি বেশী পানিও বৃক্ষের জন্য ক্ষতিকর। তাই একদেশদর্শী পরিকল্পনা না নিয়ে মুসলমানদের উচিত সুচিন্তিত ও সুষম পরিকল্পনা গ্রহণ। তবেই সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কাঙ্খিত ফল লাভ সম্ভব হবে।

সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান

ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করা প্রয়োজন একথা অনেকেই উপলব্ধি করেন– কিন্তু কার্যত: এ চর্চার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার অবকাশ অনেকের হয়ে ওঠে না। কর্মের ময়দানে নিরব অনুভূতির কোন দাম নেই– অনুভূতির বাস্তব বহিঃপ্রকাশই সেখানে মুখ্য বিষয়। এ জন্য ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের স্বার্থে যে কাজটির প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া দরকার তা হলো সকল প্রকার ইসলামী প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সংস্থায় "সাহিত্য ও সংস্কৃতির" জন্য কার্যকরী আলাদা বিভাগের ব্যবস্থা রাখা। এসব প্রতিষ্ঠান যদি জাতীয় ভিত্তিক হয় তবে তার সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে এ বিভাগকে সক্রিয় রাখতে হবে।

দ্বিতীয়ত: সারা দেশে অসংখ্য ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে যারা সব সময় ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের জন্য তৎপর। এসব তৎপরতার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করা জরুরী। এ জন্য দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। এক, সম্ভাব্য সকল ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে একটি ফেডারেশন কায়েম করে তার মাধ্যমে পরস্পরের কাজের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করা। দুই, একটি জাতীয় ভিত্তিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কায়েম করে সারা দেশে তার শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দেয়া এবং তার মাধ্যমে তৎপরতা চালানো।

শাসনের এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে বিশ্ব

সম্প্রতি ইরানের পার্লামেন্টে ইরানের সংস্কৃতি ও ইসলামী নির্দেশনা বিষয়ক মন্ত্রী এক বক্তৃতায় ইসলামী সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। সংগত কারণেই তার বক্তব্যের সাথে আমরা একমত হতে পারি। তিনি বলেছেন, "আমরা শাসনের এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছি। রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বের অবসান ঘটেছে। কর্তৃত্ব এখন সংস্কৃতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার হাতে।" (নিউজ লেটার ... ১৫, মার্চ ১৯৯৩)।

www.icsbook.info

ইরান সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর হওয়ার পরও মন্ত্রী ইরানের পার্লামেন্টে যে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি যথার্থই বলেছেন যে, "আমাদের দূর্বলতার সুযোগে পশ্চিমারা যখন সংগঠিতভাবে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে আমরা তখনও আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কোন পরিবর্তন না এনে আগের মতই কাজ করছি। ভাবখানা এমন যে, ওরা কিছুই করতে পারবে না। এভাবে এমন একটি বিষয়ের গুরুত্বকে খাটো করে দেয়ার কি কোন সুযোগ আছে? আমার মনে হয় অবশ্যই নেই। এ ধরনের অবহেলা আমাদের সমস্যাকে কেবল প্রকটই করে তুলবে।" (সূত্র-পূর্বোক্ত)।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধে পুরনো দিনের প্রযুক্তি

কেউ কেউ মনে করেন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবেলায় মুসলমানদের জন্য পুরনো দিনের প্রযুক্তিই যথেষ্ট। তারা এ সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য প্রচলিত নিজস্ব সাংস্কৃতিক কাঠামোতে ফিরে যেতে আগ্রহী। ইসলামের শত্রুরাও তাই চাচ্ছে। তাই এ পথে পা বাড়ানো কিছুতেই যুক্তিগ্রাহ্য ও বুদ্ধিবিবেক সম্মত হতে পারে না। শাসনের যে নতুন যুগে বিশ্ব প্রবেশ করেছে তাতে যুগের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হলে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। পুরনো দিনের চিন্তা-চেতনা এক্ষেত্রে কোন কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারবে না।

এ জন্য মুসলমানদের মধ্যে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের আগ্রহ ও দক্ষতা বাড়াতে হবে এবং এসব প্রযুক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন তা ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

শেষ কথা

প্রতিটি সচেতন মুসলমান যদি নিয়মিত সাংস্কৃতিক তৎপরতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহী ভূমিকা পালন করেন, নেতৃবৃন্দ সঠিক পরিকল্পনা এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন, শিল্পী সাহিত্যিকরা নিরলসভাবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন তবে এদেশে আগামী দিনের ইসলামী বিপ্লবই কেবল ত্বরান্বিত হবে না বরং যে জনগোষ্ঠী ক্রমাগত জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছে তারা তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে জান্নাতের দিকে– নাজাতের দিকে দ্রুত ছুটে আসবে। মানুষকে এ নাজাতের দিকে ধাবিত করার জন্য দরকার সময়োপযোগী পরিকল্পনা ও প্রতিটি দায়ী'র নিরলস এবং বিরামহীন প্রচেষ্টা। আল্লাহ সবাইকে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করার তৌফিক দিন। আমীন।

www.icsbook.info

ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্য চর্চা

ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি দুটো। এক. আল্লাহর কালাম, দুই. রাসূলের সুন্নাহ।

কোরআনের আলোকে সাহিত্য চর্চা

আল্লাহর কালামের দৃষ্টিতে সাহিত্য দু' প্রকারঃ শ্লীল ও অশ্লীল। একটি মানব কল্যাণকামী, অপরটি মানব সভ্যতার জন্য ক্ষতিকারক, ধ্বংসাত্মক ও অকল্যাণকর। একটি বিভ্রান্ত চিন্তার ধারক, অপরটি সত্য ও সুন্দরের পথ প্রদর্শক। ইসলাম শ্লীল ও সুরুচিপূর্ণ সাহিত্য বিকাশের সহায়ক কিন্তু অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য ইসলামের দৃষ্টিতে পরিত্যাজ্য।

পবিত্র কালামে এ ব্যাপারে যে বক্তব্য এসেছে তা বুঝতে হলে কি পদ্ধতিতে ইসলাম তার বক্তব্য উপস্থাপন করে সেদিকে নজর দেয়া দরকার। ইসলাম কোন একটি বিষয়কে তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রথমে তার নেতিবাচক এবং পরে তার সাথে সঙ্গতি রেখে ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরে। যেমন ইসলাম বলে 'লা-ইলাহা'– 'কোন ইলাহ নেই', 'ইল্লাল্লাহ'– 'আল্লাহ ছাড়া'। এখানে মূল আলোচ্য বিষয় আল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। এ বাক্যের প্রথম অংশের কোন মূল্য নেই দ্বিতীয় অংশ ছাড়া। দ্বিতীয় অংশটির প্রধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রথম অংশটির অবতারণা করা হয়েছে। সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও কোরআন একই বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করেছে। সূরা আশ্‌শোয়ারায় আল্লাহ বলেন, 'এবং কবিদের অনুসরণ করে যারা তারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখনা যে তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং এমন কথা বলে যা তারা করেনা। তবে তাদের কথা আলাদা, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে, আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।' (সূরা আশ্‌শোয়ারা, আয়াত ২২৫-২৭)। এখানেও ঈমানদার কবিদের মর্যাদা ও গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য প্রথমে মুশরিক কবিদের চারিত্র্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পরে বলা হয়েছে যে, তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে আল্লাহর পছন্দনীয় কবি, মানবতার কল্যাণের জন্য যারা কলম ধরে।

নেতিবাচক বক্তব্যের মাধ্যমে ইতিবাচক প্রসঙ্গ উজ্জ্বলতর করার কোরানিক এ বৈশিষ্ট উপলব্ধি করার অক্ষমতার কারণে কেউ কেউ এ আয়াত ব্যবহার করে

www.icsbook.info

কবিদের মর্যাদাহীন করতে চেয়েছে। কিন্তু কোরানিক বৈশিষ্ট উপলব্ধি করতে পারলে ইসলাম সাহিত্য চর্চাকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে এবং কবিদের কত উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে তা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো। কোরআনের প্রায় সকল তাফসীরকারই একমত যে এ আয়াতের মাধ্যমে সাহিত্যচর্চাকে নিরুৎসাহিত করা হয়নি বরং ঈমানদার কবিদেরকে গাইডলাইন দিয়ে তাদের কাব্যচর্চাকে আরো উৎসাহিত করা হয়েছে।

ফতহুল বারীর এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, "এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, হাসসান বিন সাবিত, কা'ব ইবনে মালিক প্রমূখ সাহাবী কবি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলের খেদমতে হাজির হন এবং আরজ করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাজিল করেছেন! আমরাওতো কবিতা রচনা করি, এখন আমাদের উপায় কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিসাল্লাম বললেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের কবিতা যেনো অনর্থক এবং ভ্রান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লেখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল।" তাফসীরকারগণ আরো বলেছেন, "আয়াতের প্রথমাংশে মুশরিক কবিদেরকে বুঝানো হয়েছে।" বস্তুতঃ এ আয়াতের মাধ্যমে একদিকে বিপথগামী কবিদের চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ঈমানদার কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করা হয়েছে। এতে করে ঈমানদার কবিগণ তাদের কাব্যচর্চা যে নিরর্থক নয় এ ব্যাপারে সন্দেহাতীত হয়েছেন এবং আল্লাহর দেয়া গাইডলাইন মোতাবিক কাব্যচর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত হয়েছেন।

এবার এ আয়াতের আরো একটি বৈশিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। আল্লাহ বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন প্রকার স্বভাব, প্রকৃতি ও গুণ দিয়ে ভূষিত করেছেন। আল্লাহর দেয়া এ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা মানুষের সাধ্যের অতীত। যারা কবি তারা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা ভাবুক, কল্পনাপ্রবণ ও আবেগী। এটা তাদের স্বভাবধর্ম। এ কল্পনাপ্রবণতা না থাকলে কাব্য হবে কিভাবে? এ কল্পনাপ্রবণতা কবিদের জন্য আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত, যে নেয়ামতের কারণে সাধারণ মানুষ যা পারেনা তারা তা পারেন, আর পারেন বলেই তারা কবি। কবিদেরকে এ ভাবের জগৎ থেকে, কল্পনাপ্রবণতা থেকে দূরে রাখা আল্লার অভিপ্রায় নয়। তবে তারা যেন ভাবের জগতে বিচরণ করতে গিয়ে জগত সংসার ভুলে না যায় সেদিকটিও দেখতে হবে। এজন্যই আল্লাহ কোথাও কবিদেরকে ভাবের জগত থেকে বেরিয়ে আসতে বলেননি, কিন্তু এমন কয়েকটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন যাতে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হতে না পারে। আল্লাহর বর্ণনাভঙ্গি কত চমৎকার ও তাৎপর্যমন্ডিত। আল্লাহ বলছেন, 'তুমি কি দেখনা যে তারা (কবিরা) প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে

www.icsbook.info

বেড়ায় এবং এমন কথা বলে যা তারা করেনা। তবে তাদের কথা আলাদা, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।' এ আয়াতের তাৎপর্যময় অংশ হচ্ছে 'তবে তাদের কথা আলাদা' অংশটুকু। এর মাধ্যমে আল্লাহ উভয় অংশের মধ্যে এমন একটি সংযোগ-সেতু স্থাপন করেছেন যা অতুলনীয় বাকচাতুর্যে পরিপূর্ণ। কবিসত্ত্বার অধিকারী একজন মানুষকে আল্লাহ জানাচ্ছেন, যদি সে তার এ কবি স্বভাবের সাথে চারটিমাত্র গুণ আয়ত্ব করে নিতে পারে তাহলেই সে আল্লাহর পছন্দনীয় ও প্রিয়ভাজনদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। এ গুণ চারটি হচ্ছে, ঈমান আনা, সৎকর্ম করা, আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করা এবং নিপীড়িত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে একজন ঈমানদার কবির কি কি বৈশিষ্ট থাকতে হবে তা সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

১. একজন কবি ঈমানদার কবিদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে প্রথমেই তাকে ঈমান আনতে হবে।
২. ঈমান আনার পর সে আর অসৎ কর্মে লিপ্ত হবেনা।
৩. তার ভাবপ্রবণতা যেন তাকে বিপথগামী করতে না পারে সেজন্য সে আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করবে।
৪. আর যখনি নিপীড়িত হবে তখনই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সচেষ্ট হবে।

এ আয়াতে উল্লেখিত প্রথম ও দ্বিতীয় গুণ দুটো কবির ব্যক্তিসত্ত্বার সাথে সম্পর্কিত। তৃতীয় ও চতুর্থ গুণদুটোর সম্পর্ক তার কাব্য সত্ত্বার সাথে।

এখানে একজন কবিকে আল্লাহ ভাবপ্রবণতা বর্জন করার হুকুম না দিয়ে আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করার মাধ্যমে তাকে সঠিকখাতে প্রবাহিত করতে বলেছেন। এতে করে তার বিপথগামী হওয়ার ভয় যেমন তিরোহিত হবে তেমনি কাব্যচর্চা থেকেও তাকে সরে দাঁড়াতে হবেনা। এর মধ্য দিয়ে কবিদের প্রতি আল্লাহর এক ধরণের স্নেহময় প্রশ্রয়তা লক্ষ্য করা যায়– যেমন প্রশ্রয়ধন্য হয় অন্যান্য সন্তানের তুলনায় পিতামাতার কাছে কোন আহলাদী সন্তান।

এ আয়াতে চতুর্থ যে গুণটির কথা বলা হয়েছে তা মূলতঃ কবিদের জন্য আল্লাহর দেয়া একটি কর্মসূচী। যেখানে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে কোন না কোন পর্যায়ে মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন হবেই। এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রেও শয়তান মানুষকে বিপথগামী করার কাজ থেকে বিরত হবেনা। এমতাবস্থায় শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ কোন অন্যায়ে লিপ্ত হলে হয় সে নিজের অধিকার ক্ষুন্ন করবে নয়তো অন্যের। ফলে মানবিক সত্ত্বা নিপীড়নের শিকার হবে। এ নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে কবিদের। মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলার জন্য, নিপীড়ন ও নির্যাতনের ব্যাপারে জনগণকে সজাগ করার জন্য,

www.icsbook.info

কিসে এবং কিভাবে মানবতা বিপর্যস্ত হচ্ছে তা স্পষ্ট করার জন্য সভ্যতার সপক্ষে প্রতিশোধের বানী উচ্চকিত করার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে কবিদের। ঈমানদার কবিদের অপরিহার্য গুণ হিসাবে 'নিপীড়িত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে' আল্লাহর পক্ষ থেকে একথা জুড়ে দেয়ার এটাই হচ্ছে মূল তাৎপর্য।

সূরা আশ্‌শোয়ারা ছাড়াও সূরা আম্বিয়ার ৫ম আয়াত, সূরা সাফফাতের ৩৬ আয়াত, সূরা তুরের ৩০ আয়াত, সূরা আল হাক্কার ৪১ আয়াত, সূরা ইয়াসীনের ৬৯ আয়াতসহ কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় কবি ও কবিতা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এর কারণ তৎকালীন আরবে তখনো গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেনি। মূলতঃ সাহিত্য বলতেই তখন ছিল কেবলমাত্র কবিতা। এ জন্যই সাহিত্য বলতে কোরআনে কবিতারই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ আলোচনায় কবি বলতে 'কবি ও সাহিত্যিক' এবং কবিতা বলতে কবিতার সাথে সাহিত্যকেও বুঝতে হবে।

সুন্নাহর আলোকে সাহিত্য চর্চা

ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্য বিচারের দ্বিতীয় মাপকাঠি হচ্ছে সুন্নাহ। রাসূলের জীবন ও হাদীস থেকে এ ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় মুমীনদের দায়িত্ব হচ্ছে তার যথার্থ অনুসরণ।

কবি পরিবারে নবীর আগমন

কবি ও কবিতার জন্য ভূবনখ্যাত এক জনপদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাসূল (সা.)। দু'একটি খন্ড কবিতা ছাড়া তিনি যদিও কোন কবিতা রচনা করেননি কিন্তু তাঁর আম্মা আমেনা বিনতে ওয়াহাব ছিলেন যুগধর্মের দাবীতে একজন স্বভাব কবি। রাসূল (সা.)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি যে মর্সিয়া বা শোকগাঁথা গেয়ে রোনাজারি করেছিলেন তা ইতিহাসখ্যাত। রাসূল (সা.)-এর জন্মের আগে বিবি আমেনা জগৎখ্যাত এক শিশুর জন্মের বিষয়ে প্রায়ই স্বপ্নাদিষ্ট হতেন। এ ভাবাবেগেও তিনি বেশ কিছু খন্ড কবিতা রচনা করেন। তাঁর পিতৃব্য আবু তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিবেরও কবিখ্যাতি ছিল সুবিদিত। অর্থাৎ তাঁর জন্ম হয়েছিল এক কবি পরিবারে।

নবুওয়াত প্রাপ্তির আগেই রাসূলে খোদার (সা.) মধ্যে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ওপর একটি অসাধারণ দখল এসে গিয়েছিলো প্রকৃতিগতভাবে একজন আরব হবার কারণে। এ ছাড়া ভাষার গতি ও লাবণ্যের প্রতি তাঁর একটি স্বভাব সুলভ কৌতুহলও ছিলো। একবার হযরত ওমর (রা.) রাসূল (সা.)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আপনি আমাদের মধ্যে বড় হলেন, অথচ কথা বলেন এতো সুন্দর ভাষায়!' অন্যান্য সাহাবীরাও তাঁর সুমধুর বাচনভঙ্গির প্রশংসা

www.icsbook.info

করতেন। উত্তরে তিনি বলতেন, 'এতো আমার অধিকার, কারণ কোরআন তো আরবী মুবীন ভাষায় আমার নিকটেই নাযিল হয়েছে।' এভাবেই আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে সাহিত্যের এক সৌরভময় ভুবনে প্রেরণ করেছিলেন।

কবি ও কবিতার প্রতি ভালবাসা

তাঁর জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি কবিতা পছন্দ করতেন, কবিদেরকে ভালবাসতেন। এ প্রসঙ্গে দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

● সাহাবী শরীদ রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে কোন বাহনের পিঠে সওয়ার ছিলাম। এমন সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'উমাইয়া ইবনে আবী সাল্‌তের কোন কবিতা কি তোমার মনে আছে?' (উল্লেখ্য উমাইয়া ইবনে আবী সাল্‌ত জাহেলী যুগের বড় কবি ছিলেন এবং জাহেলিয়াতের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।) রাসূল (সা.)এর প্রশ্নের জবাবে শরীদ (রা.) জবাব দেন, 'হ্যাঁ মনে আছে।' তিনি বললেন, 'পড়ো।' আমি একটি কবিতা পড়ে থামলে তিনি বলেন 'আরো পড়ো।' এভাবে আমি তার একশ'টি কবিতা পড়লাম।'

● হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, রাসূল (সা.) প্রখ্যাত মহিলা কবি খানসা (রা.)-এর কবিতা বেশ পছন্দ করতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল শ্রুতিমধুর এবং তিনি চার শহীদের জননী ছিলেন। মাঝে মাঝে রাসূল (সা.) তাঁর কবিতা শুনতে চাইতেন এবং হাত ইশারা করে বলতেন, 'খান্‌সা, আরও শোনাও'।

● রাসূল (সা.) দীর্ঘ সফরে বের হয়েছেন। মরুপথে উটের পিঠে। রাতও হয়েছে বেশ। বললেন 'হাস্‌সান কোথায়?' হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ) এগিয়ে এলেন। বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্, (সা.) এই তো আমি।' মহানবী (সা.) বললেন, আমাদের কিছু 'হুদা' শুনাও তো। শুরু করলেন কবি। ওদিকে মহানবী (সা.) শুনছেন। উটও চলছে অধিকতর ক্ষিপ্রতায়। উটের দ্রুত চলার কারণে মনে হচ্ছে হাওদা যেনো পেছন দিকে ভেঙে পড়ে যাবে। থামতে বললেন মহানবী (সা.)। আর মন্তব্য করলেন, 'কবিতাকে এজন্যই বলা হয় বিদ্যুতের চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং এর আঘাত শেলের আঘাতের চেয়েও ক্ষিপ্র ও ভয়ানক।'

● শোকে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় রাসূল (সা.)কে স্ফুর্তিতে রাখার জন্য সাহাবী কবিরা সব সময়ই কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। রাসূল (সা.) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা.) উটের লাগাম ধরে হাঁটছেন আর গাইছেনঃ

'কাফির বংশ, শোনরে ওরে পথ ছেড়ে দে
সকল ভালো রাসূল মাঝে, নে লুটে নে।'

www.icsbook.info

● মুসলমানরা কুবার মসজিদ বানাতে ব্যস্ত। মহানবীও আছেন তাঁদের সাথে। তারা কাজ করছেন আর সমস্বরে ইবনে রাওয়াহার (রা) কবিতা আবৃত্তি করছেনঃ

'পুণ্য-পথের পন্থিরা গড়ে এ মসজিদ
কুরান পড়ে দাঁড়িয়ে, বসে– যায় না নিঁদ।
শক্ত আঘাতে পাথর ছুটেছে দিগ্বিদিক।'

● মহিলা কবি নাবীখাজাদী অতি বৃদ্ধ বয়সে সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মদীনায় আসেন ইসলাম গ্রহণের জন্য। রাসূলে করীম (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে নীচের কবিতাটি পেশ করে তিনি নবীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

'সত্যের দিশারী এই রাসূলের সমীপে এসেছি,
এমন কিতাব তিনি পড়েন উল্লাসে, যে কিতাব সমুজ্জ্বল ছায়াপথ প্রায়;
সুউচ্চ আকাশ ছোয়া আমাদের সকল গৌরব
তারো চেয়ে উর্ধ্বে যাবে এ গৌরব এই তো কামনা।'

● বসে আছেন প্রিয়নবী (সা.)। কবি আন নাবিগাহ্ এলেন। আবৃত্তি করতে থাকলেন স্বরচিত কবিতা। যখন বললেনঃ

মর্যাদা ও মহিমায় আমরা পৌঁছেছি নীলাভ্র ভেদ করে।
আরো চাই, তারো উর্ধ্বে দেখা যাক আমাদের বিজয় নিশান।'

কেমন যেন বাড়াবাড়ি মনে হলো নবীজীর কাছে। প্রশ্ন করলেন, 'আবু লায়লা (কবির ডাক নাম) তারো উর্ধ্বে দেখবে তোমার বিজয় নিশান, কোথায়?' কবি বললেন, 'জান্নাতে, হে আল্লাহর হাবীব।' এবার মহানবী (সা.) বললেন, 'ঠিক আছে। ইনশাআল্লাহ্ দেখবে একদিন।'

এরকম আরো অসংখ্য ঘটনা আছে, যেসব ঘটনার মধ্য দিয়ে কবি ও কবিতার প্রতি রাসূলে করীমের সীমাহীন ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। কবি ও কবিতাকে, সাহিত্য ও সাহিত্যিককে ভালবাসা তাই সুন্নাতে রাসূলের অন্তর্ভূক্ত। কবি ও কবিতার প্রতি অবজ্ঞা বা অনাগ্রহ সুন্নাতে রাসূলের পরিপন্থী।

কাব্য চর্চায় উৎসাহ প্রদান

রাসূলে করীম (সা.) নিজে সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন এবং কবিতা শুনতে ভালবাসতেন এতটুকুতেই তাঁর কাব্যপ্রেম সীমাবদ্ধ ছিলনা। অন্যদেরও তিনি কবিতার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'যে দুটো মনোরম আভরণে বিশ্বাসীকে আল্লাহ সাজিয়ে থাকেন, কবিতা তার একটি।' আরো বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে কোন কোন কবিতায় রয়েছে প্রকৃত জ্ঞানে কথা।'

সাহাবীদেরকে তিনি কবিতা চর্চার তাগিদ দিতেন। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় তিনি সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের কবিতা

www.icsbook.info

শেখাও, তাহলে তাদের কথা মিষ্টি ও সুরেলা হবে।' এভাবেই মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে কাব্য চর্চায় উৎসাহী করে তোলেন।

কাব্য চর্চায় সাহাবীদের ভূমিকা

রাসূল (সা.)-এর উৎসাহে তাঁর ঘনিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে যাঁদের কাব্যচর্চার যোগ্যতা ছিল তাঁরা প্রায় সকলেই কাব্যচর্চা করতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি হাসসান বিন সাবিত (রা.), লবীদ বিন রাবিয়াহ (রা.), কা'ব ইবনে যোহায়র (রা.), আবদুল্লা বিন রাওয়াহা (রা.), কা'ব বিন মালিক (রা.), আব্বাস বিন মিরদাস (রা.), যুহায়র বিন জুনাব (রা.), সুহায়ম (রা.), আন নাবিগা ওরফে আবু লায়লা (রা.) প্রমূখ। মহিলা কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নবী নন্দিনী ফাতেমাতুয যোহরা (রা.), হযরত খানসা (রা.), কবি নাবিখাজাদী (রা.) প্রমূখ। এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজন খলিফার প্রত্যেকেই কাব্যচর্চা করতেন। এঁদের মধ্যে তিনজনই তৎকালীন আরবের প্রসিদ্ধ কবি হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন। এরা হলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর ফারূক (রা.) ও হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)।

কাব্য জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ

কবিতার জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সাহাবী কবিদের প্রতি ছিল মহানবীর কঠোর নির্দেশ। হযরত আয়েশা (রা.) আরো বর্ণনা করেছেন, 'মহানবী (সা.) বললেন, তোমরা কাফির মুশরিকদের নিন্দা করে কাব্য লড়াইয়ে নেমে পড়। তীরের ফলার চেয়ে তা আরো বেশী আহত করবে তাদের। ইবনু রওয়াহাকে পাঠানো হলো। সম্পূর্ণ মুগ্ধ হতে পারলেন না রাসূল (সা.)। কা'আব বিন মালিকও এলেন। অবশেষে যখন হাসসান এলেন, বললেন, সবশেষে তোমরা পাঠালে ওকে? ওতো লেজের আঘাতে সংহারকারী তেজোদৃপ্ত সিংহশাবক। কথা শুনে আনন্দে জিভ নাড়তে লাগলেন হাস্সান। বললেন, যিনি আপনাকে সত্যবাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! এ জিভ দিয়ে ওদের মধ্যে চামড়া ছুলে ফেলার মত গাত্রদাহ সৃষ্টি করেই ছাড়ব।'

অন্যত্র উল্লেখিত হয়েছে, রাসূল (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করলে উঠে দাঁড়ালেন হাস্সান বিন সাবিত। বললেন, 'আমিই রইলাম তার জন্যে। তিনি আপন জিভ মেলে ধরলেন। পুনশ্চ বলে উঠলেন, 'আল্লাহর শপথ। বুসরা থেকে শুরু করে সানআর নিভৃত বস্তি পর্যন্ত আমার কথা নির্ঘোষিত হবে আজ থেকে, ইনশাআল্লাহ্।' সবাক প্রশ্ন তুলে ধরলেন মহানবী (সা.), 'তা বেশ কিন্তু আমি যে কুরাইশ গোত্রের। তাহলে কিভাবে ওদের ব্যঙ্গ করবে তুমি?' জবাব এলো, 'ময়দার পাকানো মন্ড থেকে যে ভাবে চুল বেছে আনা যায়, দেখবেন, ঐভাবেই আপনাকে

www.icsbook.info

ওদের থেকে পৃথক করবো।'

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন আরও বলেন, এই দিন থেকেই আনসারদের তিনজন ইসলামী কবি হাস্‌সান বিন সাবিত, কা'আব বিন মালিক এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহ্ কাফিরদের বিরুদ্ধে কবিতার লড়াইয়ে নেমে পড়লেন। হাস্‌সান এবং কা'আব সুর মিলাতেন কাফিরদের সুরে সুরে। কাফিরদের পরাজয়ের ঘটনা, তাদের বংশীয় সুখ্যাতি এবং ঐতিহ্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি ফুটে উঠতে লাগলো কবিদ্বয়ের কবিতায়। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ্? তিনি তার নিন্দাকাব্যে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন তাদের ঈমান গ্রহণ না করার আসল রহস্য। সে সময় হাস্‌সান ও কা'আবের কবিতা ছিলো কাফির মুশরিকদের জন্যে সুতীক্ষ্ণ তীরের অসহ্য আঘাত। ইবনে রাওয়াহর কবিতায় তেমন আহত হতো না তারা। কালক্রমে তারা সবাই মুসলমান হলো। উপলব্ধি করতে পারলো ইসলামের অন্তর্নিহিত শিক্ষাসমূহ। এবং তখন তারা বুঝলো ইবনে রাওয়াহ্'র কবিতাই ছিলো তাদের জন্য বিষমিশ্রিত শেল! যা দারুণ বেদনাদায়ক এবং প্রদাহ সৃষ্টিকারী ব্যঙ্গ।

একবার এক ব্যক্তি আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)কে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, 'ওরা যে ভাবে কবিতার বাণ আমাদের দিকে ছুড়ছে, সেক্ষেত্রে আমাদের হয়ে আপনিও এর জবাব দিন না।' তিনি উত্তরে বললেন, হাঁ দেয়া যায়। তবে মহানবী (সা.) অনুমতি দিলেই তারপর। ঐ ব্যক্তিটি সোজা গেলেন মহানবী (সা.)-এর কাছে। আরয করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্, যারা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতার তুফান তুলেছে তাদের জবাব দেয়া দরকার। আপনি আলীকে অনুমতি দিন। মহানবী (সা.) তাকে বুঝালেন, আলী এর জন্য যথোপযুক্ত নন। এরপর তিনি আনসারদের সমবেত করলেন এবং উচ্ছ্বসিত আবেগে তাদের বললেনঃ 'এতো অনস্বীকার্য, আল্লাহর রাসূলকে হেফাযত করার জন্যে অস্ত্র হাতে নিয়ে তোমারা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে কাজ করছো, কলমের ভাষা দিয়ে তাঁকে আজ হেফাযত করার সময় এসে গেছে। কে আছো তীক্ষ্ণ মসীর আঁচড় নিয়ে এগিয়ে আসবে?'

'যারা হাতিয়ারের দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে, কথার দ্বারা (অর্থাৎ কবিতার দ্বারা) আল্লাহর সাহায্য করতে কে তাদের বাধা দিয়েছে?'

'কা'আব ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসূল (সা.) আমাদের নির্দেশ দিলেন, যাও, তোমরা মুশরিকদের প্রতিপক্ষে কবিতার লড়াইয়ে লেগে যাও। কারণ মুমিন জিহাদ করে জান দিয়ে, মাল দিয়ে। মুহাম্মদের আত্মা যাঁর হাতের মুঠোয় তাঁর শপথ! তোমাদের কবিতা, তীরের ফলা হয়ে তাদের কল্‌জে ঝাঁঝরা করে দেবে।'

এভাবে রাসূল (সা.) ঐশী কালামের অনুগত কাব্যকলাকে উৎসাহিত করে তাঁর নেতৃত্বে নব উত্থিত সমাজ বিপ্লবে সাহাবী কবিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে এক নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন।

www.icsbook.info

অশ্লীলতা বর্জনের নির্দেশ

রাসূলে করীমের আগমন হয়েছিল মানুষের মধ্যে যেসব কু প্রবৃত্তি আছে তা দূর করে সেখানে সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সভ্যতার বাগানে সুবাতাস বইয়ে দেয়ার জন্য তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে যে বিপ্লব সাধন করেন তার মূল ছিল মানব জাতির চারিত্রিক সংশোধন। সমাজ সভ্য কি অসভ্য তা নির্ধারিত হয় সে সমাজের মানুষের চরিত্রের গুণে বা দোষে। তাই সুসমাজ সৃষ্টির স্বার্থে কবিতার শ্লীল অশ্লীলতার বিষয়ে রাসূল (সা.) সবসময় ছিলেন সদা সচেতন। এ প্রসংগে ইমাম মুসলিম সাহাবী আবু সাঈদ খুদরীর (রা.) একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মদীনা থেকে ৭৮ মাইল দূরে অবস্থিত আরজ নামক এক পল্লীর মধ্য দিয়ে আমরা রাসূলুল্লার (সা.) সাথে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমাদের সামনে এসে পড়লো এক কবি। সে তার কবিতা পাঠ করে চলছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ 'এই শয়তানটাকে ধরো, তোমাদের কারোর পেট (এমন) কবিতায় ভরে থাকার চাইতে পুঁজে ভরে থাকা ভালো।' উল্লেখ্য, এ কবির কবিতা ছিল অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ।

জাহেলী যুগের প্রখ্যাত কবি ইমরাউল কায়েসের কবিতা সম্পর্কে রাসূলে খোদার (সা.) মন্তব্যও এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। ইমরাউল কায়েস ছিলেন অশ্লীলতার দীক্ষাগুরু। কিন্তু 'বর্ণনার পরিপাট্য, উপমা গ্রহণের রীতি এবং প্রকাশভঙ্গীর দক্ষতা' তাঁর কবিতাকে করেছিল মোহময় ও আকর্ষণীয়। রাসূলে করীম (সা.) তার কবিতা সম্পর্কে 'নিশ্চয় তার ভাষায় আছে সম্মোহনী শক্তি এবং কাব্য-কর্মে আছে বর্ণনার পরিপাট্য' বলে মন্তব্য করার পরও তার কবিতাকে অশ্লীলতার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.)-এর দরবারে একবার কবিদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ইমরাউল কায়েসের প্রসঙ্গ এলে মহানবী (সা.) বললেন, 'দুনিয়ায় তিনি খ্যাতনামা হলেও আখিরাতে তার নাম নেবার কেউ থাকবে না। কবিদের যে বাহিনী জাহান্নামের দিকে যাবে সে থাকবে তার পতাকাবাহী।'

অশ্লীলতা বর্জনের ব্যাপারে সাহাবী কবিদের প্রতি আল্লাহর নবীর কঠোর নির্দেশ ছিল। তিনি বলেছেন, 'ইসলাম গ্রহণের পরেও যে অশ্লীল কবিতা ছাড়তে পারলো না, সে যেনো তার জিভটাই নষ্ট করে ফেললো।' অন্যত্র বলেছেন, 'কারো পেট বা হৃদয়ে যদি পুঁজ জমে পচে যায়, তবে সেই পেট বা হৃদয় অশ্লীল বা মন্দ কবিতার চেয়ে উত্তম।' আরো বলেছেন, 'অশ্লীল কবিতা দিয়ে তোমাদের দেহ মন ভর্তি করার চেয়ে রক্ত পুঁজ দিয়ে পরিপূর্ণ করা অনেক ভালো।'

কাব্য বিচারে মহানবী (সা.)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিভিন্ন সময় কবি ও কবিতা সম্পর্কে এমন কিছু

www.icsbook.info

মন্তব্য করেছেন, শ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচকদের চাইতেও যা হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক। সেসব মন্তব্যের কয়েকটি এখানে তুলে ধরছি।

● 'আরবদের সুসংবদ্ধ কথা হলো তাদের কবিতা। কবিতার ভাষায় (তাদের কাছে) কিছু চাইলে তারা তা মন ভরে দান করে। তাদের রোষের আগুন নির্বাপণ করে কবিতার অন্তঃসলিল প্রবাহ। সাহিত্য-বাসরে কবিতাই হলো তাদের জন্য মনোহর উপঢৌকন।'

● 'উট থামাতে পারে তার সকরুণ ক্রন্দন। কিন্তু আরবরা তাদের কবিতার সুর থামাতে পারে না।'

● 'নিশ্চয়ই কবিতা হচ্ছে সুসংবদ্ধ কথামালা। কাজেই যে কবিতা সত্য-আশ্রিত সে কবিতা সুন্দর। আর যে কবিতা সত্য বিবর্জিত সে কবিতার মধ্যে কোন মঙ্গল নিহিত নেই।'

● 'কবিতা কথার অনুরূপ। ভালো কথা যেমন সুন্দর তেমনি ভালো কবিতাও সুন্দর। খারাপ কবিতা খারাপ কথার মতোই অপছন্দনীয়।'

● 'কবিতা ও সাধারণ কথাবার্তার বিচার একই নিক্তিতে হতে হবে। অনাবিল এবং পরিমল কথাবার্তার যে মূল্য, শ্লীল কবিতারও সেই মূল্য। অশ্লীল বক্তব্য যেমন অপ্রীতিকর, অশ্লীল কবিতাও তেমন।'

সমসাময়িক কবিদের কাব্য বিশ্লেষণ

রাসূলে করীম (সা.) শুধু কবি ও কবিতার পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, তিনি কবি ও কবিতাকে উৎসাহিত করার জন্যে বিভিন্ন সময় কবিতার ওপর আলোকপাত করেছেন, মন্তব্য রেখেছেন এবং বিভিন্ন জনের কবিতা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এ পর্যায়ে তাঁর কাব্যপ্রীতি ও সমসময়িক কবিদের কাব্য বিশ্লেষণের কিছু নমুনা উদ্ধৃত করছি।

● উমাইয়া ইবনে আবী সাল্‌তের কবিতা শুনে রাসূল (সা.) মন্তব্য করেছিলেন, 'উমাইয়া তো প্রায় মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো।' অন্যত্র বলা হয়েছে, 'রাসূল (সা.) বলেছেন, 'উমাইয়ার কবিতা ঈমান এনেছে, অথচ মন এখনও কুফরির তমসায়।'

● অনুরূপভাবে কবি লবীদ ইবনে রাবিআহ্'র (মৃত্যু ৬৬১খৃঃ) একটি কবিতা রাসূল (সা.) খুব বেশী পছন্দ করতেন। এ কবিতার একটি পংক্তি ছিলঃ জেনে রাখো, আল্লাহ্ ছাড়া আর সব কিছুই বাতিল।' এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর মন্তব্যঃ 'কবিতায় যে সব সত্য কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সত্য কথাটি হচ্ছে লবীদের এই কবিতাটি।

● আন্‌তারা বিন শাদ্দাদ জাহেলী যুগের এক প্রখ্যাত কবি ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির বিশ বছর আগে তার মৃত্যু হয়। তার কবিতা আরববাসীর

www.icsbook.info

মুখে মুখে প্রচারিত ছিলো এবং রাসূলে করীম (সা.) নিজেও তার কবিতায় মুগ্ধ ছিলেন। কবি আন্‌তারা সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা.)-এর মন্তব্যঃ 'আনতারাহ্ ছাড়া অন্য কোন আরববাসীর এত প্রশংসা আমার কানে পৌঁছেনি। (জীবিত থাকলে) তাকে দেখার আমার বড় ইচ্ছা ছিল।' রাহমাতুললিল আলামীন, সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে কবিতার জন্য একজন কবিকে দেখার এই যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, এর দ্বারা কবি ও কবিতার প্রতি তাঁর প্রেমেরই অনন্য প্রকাশ ঘটেছে।

● কবি সুহায়ম-এর একটি কবিতা একবার মহানবী (সা.)-এর সামনে আবৃত্তি করা হলো। তার একটি চরণ ছিলো এরকমঃ

'স্তবকীর্তন তার করি অনিমেষ
দয়ার দরিয়া যেন হয়না তা শেষ।'

শুনে মহানবী (সা.) বললেন, 'বেশ তো। ঠিক কথাই বলেছে কবি। এ ধরনের কথায় আল্লাহতা'লা খুশী হন। আর যাকে আল্লাহ্ সোজা পথে রেখেছেন এবং নৈকট্য দিয়েছেন সে জান্নাত পাবে।'

● একবার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) রাসূল করীম (সা.)-এর সামনে যুহায়র বিন জুনাব-এর একটি কবিতা পড়ে শুনাচ্ছিলেন। তিনি যখন পড়লেনঃ

'কেন বা হেয় ভাবো,
আতুরের দিকে বাড়াও দু'হাত
একদিন নিশ্চয় পাবে প্রতিদান
সেওতো বান্দা খোদার, সেও ইনসান।
আর কিছু না-ই হোক
গাইলো তোমার সুকৃতির গান
সেটাও কিন্তু কম নয় প্রতিদান।'

রাসূল (সা.) শুনে বললেন, 'আয়েশা, কবির কথা কিন্তু ঠিক। আসলে যে মানুষের সুকৃতি সইতে পারে না, আল্লাহর সুকৃতি গাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।'

● একবার রাসূলের (সা.) সামনে উমাইয়া ইবনে আবী সালতার একটি কবিতার চরণ পাঠ করা হলে তিনি বললেন, 'যথার্থই বলেছে উমাইয়া। আরশবাহীদের চিহ্নও এরকম।' চরণটি ছিলঃ

'ও যে ওঁৎ পেতে বসে থাকা শার্দূল যেন,
শক্তিমান বৃষ এক ডান পদতলে
আর বাম পদতলে শিকারী শকুন।'

● একবার এক কবি এক কীর্তিগাঁথা গাইছিল। তার একটি চরণ ছিল এরকমঃ

'কি বংশ মোর জানতে চাও? তবে শোন আমি হিমায়রী

www.icsbook.info

রবীয়া কিংবা মুদার বলে নেই কোন মোর পূর্বসূরী।'
রাসূল (সা.) শুনে বললেন, 'এ কথা তার বিবেকের উপর আঘাতকারী এবং এ সব কীর্তিগাঁথা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেরও নৈকট্য বিরোধী।'
মহানবী (সা.) যে সমসাময়িক কবিদের কাব্যচর্চা সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন এবং সে আলোকে ঈমানদার কবিদেরকে পথনির্দেশনা দিতেন সেরকম বহু ঘটনা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। স্থানাভাবে এখানে কেবল কয়েকটি নমুনা পেশ করা হল।

ঈমানদার কবিদের কাব্য সাধনার খোঁজখবর নেয়া

সমসাময়িক ঈমানদার কবিদের কবিতা নিয়ে রাসূল (সা.)-এর ঔৎসুক্য ছিল অতুলনীয়। একবার মহানবী (সা.) হযরত হাস্সান (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আবু বকরকে নিয়ে কোন কবিতা কি এ পর্যন্ত লিখেছো?' হযরত হাস্সান (রাঃ) জবাব দিলেন, হাঁ লিখেছি।' রাসূল (সা.) বললেন, 'শোনাও তো দেখি।' কবি হাস্সান বিন সাবিত (রা.) হযরত আবুবকর (রা.)-কে নিয়ে লেখা তাঁর কবিতা শোনাতে শোনাতে যখন নীচের পংক্তিগুলো পড়তে লাগলেনঃ
'সুউচ্চ সওর গুহার দ্বিতীয় ব্যক্তি সে তিনিই
(যখন) রক্ত লোলুপ শৃগালেরা শুঁকে শুঁকে শিখরে এলো।
রাসূলের সঙ্গে আছেন সদা এক ছায়াতরু
সবাই জানে নবীর পরেই তিনি, সৃষ্টি মাঝে সবার চেয়ে সেরা।'
–তা শুনে মহানবী (সা.) খুব হাসলেন এবং বললেন, 'ঠিক বলেছো হাস্সান। যা বলেছো তার যোগ্য তিনিই।'

কবিদের ওপর আস্থা স্থাপন

কবিদের ওপর রাসূল (সা.)-এর গভীর আস্থা ছিল। একবার কবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর ওপর মহানবী (সা.) অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব অর্পন করেন। এই কবি যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতির দায়িত্বও লাভ করেছিলেন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় 'শহীদ' হওয়ার মর্যাদাও লাভ করেছিলেন।

বক্তৃতায় কবিতার ব্যবহার

রাসূল (সা.) বক্তৃতা দেবার সময় সাহাবী কবিদের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তৃতা করতেন। তিরমিযী শরীফের বর্ণনাঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)কে প্রশ্ন করা হলো, 'মহানবী (সা.) কি তাঁর বক্তৃতায় কখনো কবিতার উদাহরণ নিয়ে আসতেন?' হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বললেন, 'হাঁ উদাহরণ দিতেন বৈ কি! তিনি কবি ইবনু

www.icsbook.info

রাওয়াহার কবিতা দিয়ে উদাহরণ টানতেন। কখনো বা উপমা দিতেন তারাফ বিন আবদ-এর এ কবিতা দিয়ে :

'অনাগত কাল শিখাবে তোমায় যা তুমি জানতে না,
এবং নিয়ে আসবে খবর, কভু যা শোন নি।'

সাবা মুয়াল্লাকার কবি লবীদ ইবনে রাবিআহ্'র কবিতার দু'টি চরণও এভাবে হাদীস শাস্ত্রের অংশ হিসেবে অমর হয়ে আছেঃ

'আলা কুল্লু শাইয়্যিন মা খালাল্লাহু বাতেনু,
অকুল্লু নায়িমিন লা মহালাতা যাইলু।'

অর্থাৎ

'সাবধান হও, আল্লাহ্ ছাড়া আর সবই মিথ্যা, অসাড়
সব নিয়ামতই একদিন হবে অবলুপ্ত,
শুধু অবলুপ্ত হবে না জান্নাতের অমূল্য সম্ভার।

তুলনামূলক অধ্যয়ন

তুলনামূলক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.)-এর একটি উপদেশের কথা স্মরণ করা যায়। তিনি তরুণদেরকে জাহেলিয়াতের সাহিত্য পাঠ করার তাগিদ দিতেন, কেননা তুলনামূলক পঠন-পাঠন সেই গুণগত তারতম্যের সঠিক অনুধাবণের জন্য বেশ অপরিহার্য বলেই তিনি বিবেচনা করতেন।'

রাসূলে করীমের কাব্য চর্চা

মহানবী (সা.) কবি ছিলেন না। নবী হিসাবে কাব্যচর্চা তাঁর জন্য শোভনও ছিলনা। কিন্তু তারপরও রাসূল (সা.) কখনো কখনো দু'একটা টুকরো মিসরা বানিয়ে আবৃত্তি করতেন। খন্দকের যুদ্ধে সাহাবীদের সংগে পরীখা খনন করতে করতে রাসূল (সা.) গাইছিলেন :

১. 'আল্লাহ্র নামে শুরু করি এই কাজ
যাঁর অসিলায় পেলাম পথের দিশা
করি যদি কেউ অন্যের এবাদত
ভাগ্যে জুটবে দুর্ভাগ্যের গভীর অমানিশা।
প্রভু আমাদের মহামহিম, মহান চিরদিন
আমাদের দীন উত্তম আর চির অমলিন!'

২. আল্লাহ! পরকালের জীবন ছাড়া আরতো জীবন নেই।
আনসার হোক, মোহাজের হোক
নাজাত যেনো পায়গো প্রভু তোমার ক্ষমাতেই।

www.icsbook.info

রাসূলে করীম (সা.) মুখে মুখে এ চরণটিও রচনা করেছিলেনঃ 'আনান্নাবিউ লা কাজিব, আনা ইবনু আবদিল মুত্তালিব।' অর্থাৎ
'আমি নবী, মিথ্যাবাদী নই।
আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর হই।'
ওহুদের যুদ্ধের এক পর্যায়ে রাসূল (সা.) একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। এক খন্ড পাথরের আঘাতে তাঁর আঙুল থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকলে তিনি আবৃত্তি করেছিলেন এ পংক্তি কয়টিঃ
"হাল্ আন্‌তে ইন্না ইছবাউল দুমীতে,
ওয়াফি সাবিলিল্লাহি মা লাকীতে।" অর্থাৎ
'হে অঙ্গুলী! তুমি তো একটি আঙুল বৈ কিছুই নও।
সুতরাং যা কিছু হয়েছে, তাতো আল্লাহর রাস্তায় হয়েছে
তাই এতে অনুশোচনা ও দুঃখ কিসের?'

বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে কবিদেরকে সহযোগিতা করা

একবার হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.)কে লক্ষ্য করে রাসূল (সা.) বললেন, 'তুমি আবুবকরের কাছে যাও। মুশরিকদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের কালো অধ্যায় তিনি তোমাকে আনুপূর্বিক বলতে পারবেন। গুনে গুনে বংশের নানাদিক তোমাকে দেখাতে পারবেন। আর তুমিও সে আলোকে নিন্দাকাব্য রচনা করতে সক্ষম হবে। যাও, তোমার সাথে জিব্রীল রয়েছেন।'
অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি হাস্‌সানকে বললেন, 'যাও, আবুবকরের কাছে যাও। তিনি ওদের বংশের সব খবর রাখেন। হাস্‌সান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে এলেন তাঁর কাছ থেকে। এবার মহানবী (সা.) পথ নির্দেশনা দিলেন, ওমুক নারী সম্পর্কে কিছু বলো না। ওমকু সম্পর্কে বলতে পার। যখন হাস্‌সানের কবিতা কুরাইশদের দু'কান ছিদ্র করে দিতে চাইলো, তারা প্রত্যেকে তারস্বরে চিৎকার শুরু করলো। বলতে থাকলো, একি, এসব আবু বকর ছাড়া আর তো কেউ জানতো না!'

কবিদেরকে খেতাব প্রদান

হাদীস শরীফের বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, কবিদেরকে খেতাব প্রদান এবং সভাকবি করার রেওয়াজ মহানবী (সা.)-এর আমলেও ছিল। রাসূলে মকবুল (সা.) তাঁর প্রিয় সাহাবী কবিদের মধ্য থেকে কবি হাসসান বিন সাবিত (রা.)কে তাঁর সভাকবির মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তাঁকে বলা হতো 'শায়েরুর রাসূল' বা 'রাসূলের কবি'।

www.icsbook.info

কবিদের জন্য দোয়া করা

ঈমানদার কবিরা যেন উত্তম কবিতা রচনা করতে পারেন সেজন্য মহানবী (সা.) কবিদের নাম ধরে ধরে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন। তিনি এ দোয়া করতেন উচ্চস্বরে, যেন অন্যান্য সাহাবীরাও শুনতে পান। অধিকাংশ সময় তিনি এ দোয়া করতেন কবিদের সম্মুখে, যেন কবিরা অধিক আস্থাশীল, দায়িত্ববান এবং সৃজনশীলতায় আরো যত্নবান হওয়ার প্রেরণা পায়। কবি হাস্সান বিন সাবিত কবিতা আবৃত্তি শুরু করলে রাসূলে খোদা (সা.) তাঁর জন্যে এ বলে দোয়া করতেনঃ 'হে আল্লাহ, রুহুল কুদ্দুসকে দিয়ে তুমি তাকে সাহায্য করো।'

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায়, শায়েরুর রাসূল কবি হাসসান বিন সাবিত কবিতা আবৃত্তি শুরু করলে কবিকে উৎসাহিত করার জন্য কখনো কখনো মহানবী (সা.) সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, 'হাস্সানের জিভ যতদিন রাসূলের পক্ষ হয়ে কবিতার বাণী শুনিয়ে যাবে, ততদিন তার সাথে জিব্রীল থাকবেন।'

কবিদের পুরস্কৃত করা

● একবার মিশরের রোমক সম্রাট দুই অপরূপা সুন্দরী রমনীকে রাসূল (সা.)-এর খেদমতে পাঠালেন উপঢৌকন হিসেবে। মহানবী (সা.) এদের মধ্য থেকে শিরী নামের একজন রমনীকে 'রাসূল (সা.)-এর কবি' হিসাবে খ্যাত কবি হাস্সান বিন সাবিতকে উপহার হিসাবে প্রদান করলে হাস্সান বিন সাবিত (রা.) তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এভাবে মহানবী (সা.) কবি হাসসান বিন সাবিত (রা.)কে তুষ্ট করতে চেয়েছেন। বস্তুত একজন কবির প্রতি মহানবীর (সা.) ভালবাসা ও বন্ধুত্বের এ ছিল অনন্য প্রকাশ।

● কবি কা'ব ইবনে যুহায়র ছিলেন প্রসিদ্ধ 'সাবা মুয়াল্লাকা'র (ঝুলন্ত কবিতা সপ্তক) অন্যতম কবি যুহায়র-এর সুযোগ্য সন্তান। কা'ব (রা.) পিতার প্রতিভার উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু ইসলামের শত্রুতার ব্যাপারে তাঁর প্রতিভা, ওজস্বিতা ও উত্তরাধিকার ছিল এমনি এক মারাত্মক পর্যায়ের যে মক্কা বিজয়ের পর যে দশজন কুখ্যাত কাফিরের প্রাণদন্ড ঘোষিত হয়েছিল, যুহায়রের পুত্র কা'ব ছিলেন তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। তখনও তিনি ইরাকে অবস্থান করে আল্লাহর নবী (সা.) ও ইসলামের বিপক্ষে কুৎসা ও বিদ্বেষ প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। কিছুদিন পর আল্লাহ্পাক তাঁর মনোবিপ্লব সাধন করায় তিনি ছদ্মবেশে মদিনায় উপস্থিত হয়ে রাসূল (সা.)-এর কাছে নিজেকে নিবেদন করেন। এসময় কবি কা'ব ইবনে যুহায়র তার বিখ্যাত কবিতা 'বা'নাত সুআদ' রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে পেশ করলে মহানবী (সা.) খুশি হয়ে নিজের গায়ের চাদর খুলে কবিকে তা উপহার হিসাবে প্রদান করেন।

www.icsbook.info

● 'কাসিদাতুল বুরদাহ'-এর রচয়িতা সাইদ বিন হাসান বুসীরী (জন্ম ১২১২ খৃঃ), মিসরের বুসীর নিবাসী বার্বার জাতীয় একজন কবি, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে নিরাময়ের আশায় তিনি 'কাসিদাতুল বুরদাহ' কবিতা রচনা শুরু করলেন। 'বানাত সুআদ'-এর মত কিছু কালজয়ী পংক্তি রচনা করবেন এবং রাসূলে পাক (সা.)-এর রওজায় তা পাঠ করবেন- এরূপ ছিল কবির ইচ্ছা। প্রগাঢ় প্রেমোন্মাদনায় কাসিদা রচনা সমাপ্ত হলে স্বপ্নে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দর্শনলাভ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, স্বপ্নাবস্থায় রাসূল (সা.) কবিকে আপন চাদর পরিয়ে দিয়েছিলেন [যেভাবে হযরত কাব (রা.) চাদর উপহার পেয়েছিলেন] এবং সকালে জেগে উঠে কবি নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় দেখতে পান।'

কবিদেরকে তার প্রাপ্যের চেয়ে অধিক সুবিধা প্রদান

একবার হুনায়নের যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমত মহানবী (সা.) ভাগ করে দিচ্ছিলেন। কবি আব্বাস বিন মিরদাসকে দিলেন চারটি বলিষ্ঠ উট। এতে তাঁর মন ভরলো না। কবিতার মাধ্যমে অনুযোগের স্বরে তিনি বললেন:

'কোন দিনই বধ্যভূমি ও কেল্লাগুলো– ঘাড় ভাংতে পারেনি এই মিরদাসের
কখনো যে ছিলাম পিছে তেমনও তো নয়
আজকে যদি হইগো নীচু উঠাবে ফের মিরদাসেরে সে লোক এখন কই?'

কবিতা শুনে মহানবী (সা.) বললেন, 'ওরে, কেউ কি কবির মুখ বন্ধ করতে পার?' একথা শুনে হযরত আবুবকর (রা.) তাকে নিয়ে গেলেন। বেছে বেছে একশ উট নিয়ে যেতে দিলেন তাকে। কবি খুশীতে ডগমগ হয়ে গেলেন এ বদান্যতায়।

কবিদেরকে অর্থ সাহায্য করা

ভাবের রাজ্যে বিচরণের কারণে স্বাভাবিকভাবেই লেখক ও কবিরা বিষয়বুদ্ধিতে থাকে অপটু। আবর আত্মসম্মানবোধ টনটনে থাকার কারণে কারো কাছে কিছু চাইতেও পারেনা। ফলে দেখা যায়, সভ্যতার বাগান বানায় যে কবিরা, মানুষের মনে সুখের প্লাবন আনে যে কবিরা, তাদের ভাগ্যে জোটে দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণাকাতর জীবন। এ দুর্দশা লাঘবে মহানবী (সা.) যেভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, কবিদের সম্মানে যে চূড়ান্ত কথা বলেছেন, তারচে চূড়ান্ত কোন কথা পৃথিবীতে কেউ কোনদিন বলতে পারবে বলে মনে হয়না। তিনি বলেছেন, 'কবিদের আর্থিক সহযোগিতা দান করা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সমতুল্য।'

সন্তানের কাছে পিতা-মাতার যে মূল্য, সভ্যতার কাছে কবির মূল্য তেমনি। পিতা-মাতার কাছে ঋণী সন্তান, কবির কাছে ঋণী জাতি। এ বাণীর মাধ্যমে মহানবী চেয়েছেন জাতি যেন সে ঋণ পরিশোধ করে।

www.icsbook.info

কবিদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদান

রাসূল (সা.) কবিদের উৎসাহিত করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাঁদের যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। তিনি কবিদের যে অতুলনীয় সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন তা ছিল উপমারহিত। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, মসজিদে নববীর ভেতরে শুধুমাত্র কবিতা পাঠ করার জন্য মহানবী (সা.) একটি আলাদা মিম্বার (মঞ্চ) তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে কবি হাস্সান বিন সাবিত (রা.) সাহাবীদের কবিতা পাঠ করে শোনাতেন।

হাদীসের এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, 'মহানবী (সা.) মসজিদে হাস্সানের জন্য উঁচু মিম্বার তৈরী করিয়ে নেন। তার ওপরে চড়ে হাস্সান নবীজীর গৌরব গাঁথা এবং মুশরিকদের নিন্দা কাব্য আবৃত্তি করতেন।'

কবিদেরকে এভাবে সম্মানিত করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। কেবলমাত্র মহানবীই পেরেছিলেন মসজিদে নববীতে নিয়মিত কবিতার আসর বসাতে, খোদ নবীর ঘরে কবিতা পাঠের জন্য আলাদা মঞ্চ তৈরী করে দিতে– আজকের কবিরা যেমনটি কল্পনাও করতে পারেনা। বস্তুতঃ নবীর ঘর মসজিদে নববীতে খোদ মহানবী (সা.) কর্তৃক কেবলমাত্র কবিতা পাঠের জন্য নির্ধারিত একটি একক ও আলাদা মঞ্চ স্থাপন কবিদের জন্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও পুরস্কার। পৃথিবীর মানুষের পক্ষে কবিদের জন্য এরচে অধিক কোন সম্মান প্রদর্শন সম্ভব নয়।

কবিতার বিনিময়ে গনীমতের অংশ লাভ

কাব্য চর্চাই কবিদের জন্য জিহাদ। জিহাদে জয় লাভের পর মুজাহিদগণের মধ্যে মালে গনীমত ভাগ করে দেয়া হতো। মুজাহিদগণ ছাড়া এ মালে গনীমত আর কেউ পেতেননা। যুদ্ধে অংশ না নিলে যদি গণীমতের মালের অংশ পাওয়া না যায় তবে কবিরা মালে গনীমত পাবেন কেমন করে? আবার কাব্যচর্চা যদি জিহাদ হয় তবে কবিরা মালে গনীমত পাবেন না কেন? সাহাবীদের মধ্যে এ প্রশ্ন দেখা দিলে মহানবী (সা.) কবিদেরকে মালে গনীমতের হিস্যা প্রদানের নির্দেশ দেন। এভাবেই কাব্য চর্চা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে কবিরা যুদ্ধে অংশ না নিয়েও রাসূলের (সা.) নির্দেশে গণীমতের মালের অংশ পেতেন।

কবিতার বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ

মহানবী (সা.) অনেককেই জীবিতাবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। কবিতা লেখার পুরস্কার হিসাবে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন হাসসান বিন সাবিত (রা.)। হাসসান বিন সাবিতের কবিতা শুনে রাসূল (সা.) ঘোষণা দিয়েছিলেনঃ 'হে

www.icsbook.info

হাস্‌সান, আল্লাহর কাছ থেকে তোমার জন্য পুরস্কার রয়েছে জান্নাত।'

আজকে যারা ইসলামী সাহিত্যের চর্চা করছেন তাদের এ কথা গভীরভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, সাহিত্য চর্চা কোন তুচ্ছ কাজ নয়, বরং সভ্যতা বিনির্মানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ্ তাদের ওপর ন্যস্ত করেছেন। এ কাজের জন্য যে মেধা ও যোগ্যতা দরকার আল্লাহই তা তাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া এ বিশেষ নেয়ামতের সদ্ব্যবহার না হলে তার জন্য তাকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। যেখানে আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনের একটি পূর্ণাঙ্গ সূরার নামকরণ আশ্‌শোয়ারা 'কবিরা' রেখে কবিদেরকে চূড়ান্ত সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন সেখানে কাব্যচর্চা তথা সাহিত্য সাধনাকে গৌণ ভাবার কোন অবকাশ নেই।

অপরদিকে রাসূলে করীম (সা.) সাহিত্য চর্চার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা আমাদেরকে বুঝতে হবে। মহানবী (সা.)ই আমাদের জীবনাদর্শ। তিনি যা করেছেন, করতে বলেছেন বা করার জন্য সম্মতি দিয়েছেন তা-ই সুন্নাহ। সাহিত্যের ব্যাপারেও একই কথা। তিনি এ ব্যাপারে যা করেছেন বা করতে বলেছেন তার যথাযথ অনুসরণ করার মধ্যেই আমাদের সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত। আজ যেটি সবচে বেশী প্রয়োজন তা হচ্ছে খন্ডিত ইসলাম নয়, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। আর এ অনুসরণ কেবল কথার মধ্যে না রেখে বাস্তবে প্রয়োগ করা।

সহায়ক গ্রন্থ ও তথ্যপঞ্জিঃ

১. তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন – মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী। অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। মদীনা মোনাওয়ারা, সৌদী আরব।
২. সীরাতে ইবনে হিশাম। অনুবাদঃ আকরাম ফারূক। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,।
৩. আরবী কাব্যতত্ত্ব– ইবনে খালদুন। অনুবাদঃ আবু রুশ্‌দ। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।
৪. দি স্পিরিট অব ইসলাম– সৈয়দ আমির আলী। অনুবাদঃ মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
৫. বঙ্গ ভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব– শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন।
৬. ইসলামি বাংলা সাহিত্য–সুকুমার সেন। আনন্দ পাবলিশার্স , কলকাতা, ভারত।
৭. আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত– সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। বুক ফোরাম, ঢাকা।
৮. না'ত যুগে যুগে–,আবদুস্ সাত্তার পবিত্র কুরআন, রাসূলে করীম (সা.) ও কবিতা।
৯. আরবী সাহিত্যের ইতিহাস– আ. ত. ম. মুছলেহউদ্দীন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১০. ঐতিহ্য চিন্তা ও রাসূল প্রশস্তি- আফজাল চৌধুরী। ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১১. ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান– আবদুল মান্নান তালিব। বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা।
১২. সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রচিত কবিতা– সংকলন ও অনুবাদ ফরীদউদ্দীন মাসউদ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
১৩. রাসূল (সা.)কে নিবেদিত কবিতা–সম্পাদক: ইশারফ হোসেন, ইসলামিক একাডেমী।
১৪. রাসূলের শানে কবিতা– আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত. প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা।

www.icsbook.info

সংযোজন-২

ইসলামী সংস্কৃতি : সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ইসলাম কি, সংস্কৃতি কি এবং ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ কি এ বিষয়গুলোই প্রথমে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে এবং পর্যায়ক্রমে এসব বিষয়ে একটি সাধারণ আলোচনা পেশ করা হলো।

ইসলাম

ক. আমরা জানি ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়- ইসলাম একটি পরিপূর্ণ, শাশ্বত ও কালাতীত জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে, ইসলাম প্রতিটি যুগে, প্রতিটি কালে মানুষের মনে যত রকমের যুগ জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়েছে তার নির্ভুল সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছে। আজ পর্যন্ত এমন অবস্থা কখনোই সৃষ্টি হয়নি যে, মানুষের মনে কোন প্রশ্নের উদয় হয়েছে অথচ ইসলাম তার সমাধান বা জবাব দিতে অপারগতা বা অস্বীকার করেছে।

খ. ইসলাম কালাতীত হতে পেরেছে এ জন্য যে, মানুষ মাত্রই যে সীমাবদ্ধতার শিকার অর্থাৎ মানুষ মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ তেমন কোন মানুষ এটি সৃষ্টি করেনি। দ্বিতীয়ত: মানুষ কোন বিশেষ সময়ের ও বিশেষ সমাজের প্রতিভূ। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই সে স্বসমাজের এবং স্বসময়ের অনুরক্ত। এদিক থেকে বৃহত্তর অর্থে মানুষ অনিরপেক্ষ ও স্বার্থান্ধ। এ ধরনের সীমাবদ্ধ প্রজ্ঞা ও স্বার্থান্ধ মনোবৃত্তিধারী কোন মানুষের পক্ষে নিরপেক্ষ, সর্বজনগ্রাহ্য ও কালাতীত মতবাদ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এ ধরনের সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ কোন মানুষের তৈরী নয় ইসলাম। ফলে, ইসলামের পিছনে মানুষের স্বাভাবিক পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বা অজ্ঞতা প্রসূত সীমাবদ্ধতা কাজ করেনি। মানুষ এবং তামাম পৃথিবী ও পৃথিবীর অন্তর্গত তাবৎ বস্তুনিচয়ের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের কল্যাণের জন্য এবং তার সামগ্রিক সৃষ্টির কল্যাণের জন্য মানুষকে ইসলামের এ নেয়ামতে ভূষিত করেছেন। যেহেতু তিনি মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং কিসে মানুষের কল্যাণ ও কিসে অকল্যাণ সে ব্যাপারে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল তাই তার দেয়া জীবনবিধানে কোন অপূর্ণতা বা ত্রুটির অবকাশ নেই। এ জন্যই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণ, শাশ্বত ও কালাতীত হতে পেরেছে।

গ. ইসলাম তার চিরন্তনতা ও কালোত্তীর্ণতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে যে পদ্ধতির মাধ্যমে তার নাম ইজতিহাদ। ইজতিহাদ ইসলামের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যার কারণে ইসলাম পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, এক কাল থেকে আরেক কালে এবং এক দেশ থেকে আরেক দেশে কোন জটিলতা ছাড়াই

www.icsbook.info

অনায়াসে বিচরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ ইজতিহাদই যুগে যুগে মানুষের জীবনে উদ্ভূত সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে।

ঘ. ইসলাম মানুষের জন্য কি চায়? ইসলাম চায় মানুষের জীবনটা হোক সুন্দর, সমস্ত কল্যাণের অধিকারী হোক মানব সম্প্রদায়। এ কারণে মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম এমন কিছু সাধারণ ও শাশ্বত মূল্যমান (Values) নির্ধারণ করে দিয়েছে, যায় ব্যত্যয় ঘটলে মানব জীবনে জটিলতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে বাধ্য। আর এ শাশ্বত ও সাধারণ মূল্যমানগুলো এতই স্বত:সিদ্ধ যে, স্থান ও কালের পার্থক্যের কারণে তাতে বিন্দুমাত্র হেরফের করার উপায় নেই। আল্লাহতে অবিশ্বাস, আখেরাতে অবিশ্বাস, মিথ্যা, জুলুম, ব্যাভিচারসহ এমন কিছু কুকর্ম আছে যার কুফল সর্বকালে, সর্বদেশে বিপর্যয় ও অকল্যাণ ডেকে আনে। আবার স্রষ্টায় বিশ্বাস, পরকালীন ভয়, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা, সৃষ্টি-প্রেম সহ এমন কিছু কল্যাণকর কাজ আছে যা সকল সমাজেই সুফলের আকর হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলাম চায় মানুষের সার্বিক কল্যাণ এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য। এ সাফল্য অর্জনের জন্যই ইসলাম মানুষের সামনে এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান পেশ করেছে। এ জীবন বিধান অনুসরণ করলে মানুষের জীবন কল্যাণ ও সফলতায় ভরে উঠবে আর এর থেকে বিচ্যুতি ঘটলে জীবনে নেমে আসবে অকল্যাণ, বিপর্যয় ও অসংগতি।

ঙ. ইসলামের শাশ্বত ও সাধারণ মূল্যমানগুলো ছাড়া মানুষের জীবনের বিস্তৃত পরিসরে মানুষকে অনেক রকম কর্মকান্ডে জড়িত হতে হয়। ইসলামের এ শাশ্বত ও সাধারণ মূল্যমানগুলো অপরিবর্তনীয়। এ অপরিবর্তনীয় বিষয়ের বাইরে মানুষ যেসব কর্মকান্ডে জড়িত হয় সেসব কাজগুলোর ব্যাপারে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রয়েছে ইজতিহাদের ব্যবস্থা। কোরআন ও সুন্নায় পারদর্শী মুফতিগণ ইসলামের শাশ্বত বিধানের আলোকে সে সব বিষয়ে ইসলামের সিদ্ধান্ত কি হতে পারে তা তারা ব্যাখ্যা করেন। এ সব বিষয়ে সময় ও পরিবেশের কারণে ব্যাখ্যায় পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মুফতিগণ এমন ব্যাখ্যাও পেশ করতে পারেন, যা সর্বোতভাবে এক ও অভিন্ন নাও হতে পারে। এসব ব্যাখ্যার মধ্য থেকে সাধারণ মুসলমান যেটিকে অধিকতর কল্যাণকর মনে করবে তা অনুসরণ করার অধিকার ইসলাম মানুষকে দিয়েছে।

দরুদ শরীফ দাঁড়িয়ে পড়তে হবে কি বসে পড়লে চলবে, টুপী গোল হবে কি কিস্তি হবে- এ ধরনের সমস্যায় মানবতার কল্যাণ বিঘ্নিত হয় না। তাই ইসলাম এগুলোকে ফরজ বা ওয়াজিব ঘোষণা করেনি। বস্তুত: ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল প্রভৃতি যে কাজের যে পরিমাণ গুরুত্ব ইসলাম দিয়েছে, হালাল-হারামের যে বিধান ইসলাম দিয়েছে তাকে যথাযথরূপে পালন করার মধ্যেই মানবতার কল্যাণ

www.icsbook.info

নিহিত। এভাবেই ইসলাম তার গ্রহণযোগ্যতার পরিধি বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর করেছে।

চ. মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সকল কাজে জড়িত হয় সে সব কাজ করার জন্য ইসলাম যে নীতিমালা দিয়েছে ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বিষয়সমূহ তার অন্তর্গত। জীবনের সামগ্রিক আচরণকে সামনে রেখে ইসলাম যে নীতিমালা দিয়েছে তাকে প্রধানত: তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে: ১) হালাল ২) হারাম ৩) মোবাহ। মানুষের জীবনের সকল কাজ বা আচরণ এর কোন না কোনটার আওতায় অবশ্যই পড়বে।

ছ. ইসলামের মূল টার্গেট যেহেতু মানুষ, সে জন্য মানুষের প্রয়োজনে ইসলাম তার অপরিহার্য, চিরন্তন বা শাশ্বত বিধানেও ব্যতিক্রমের অবকাশ রেখেছে এবং তার নীতিমালা পুরোটাই তৈরি হয়েছে মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে। যেমন কোন মানুষ যদি এমন অবস্থায় পতিত হয় যে, হারাম খাদ্য ভক্ষণ না করলে সে মারা যাবে, সে ক্ষেত্রে তার জন্য হারাম খাদ্য ভক্ষণের অনুমতি প্রদান করে ইসলাম।

মানুষের বয়স, সামর্থ্য, মেধা, যোগ্যতা এসবকে সামনে রেখেই মানুষের জন্য ইসলাম তার বিধান পেশ করেছে। কারণ এ সবের আলোকেই পরকালে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে।

ফলে একজনের জন্য যা ফরজ অন্যের জন্য তা ফরজ নাও হতে পারে। যেমন বয়সের পার্থক্যের কারণে বড়দের জন্য নামায ফরজ হলেও শিশুর জন্য তা ফরজ নয়। ধনীর জন্য যে হজ্জ ফরজ গরীবের জন্য তা ফরজ নয়। একজন বিজ্ঞ আলেমের জন্য দাওয়াতে দ্বীনের কাজ যেভাবে বাধ্যতামূলক একজন মুর্খের জন্য সেভাবে নয়। বয়স হওয়ার পরও একজন পাগলের জন্য নামায ফরজ নয় তার বুদ্ধি ভ্রান্তির কারণে।

ইসলাম কতটা মানবকল্যাণকামী তার পরিচয় পাওয়া যায় মুসাফিরের জন্য নামাযে ছাড় দেয়া থেকে। সফর একজন মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত শ্রান্ত করে দেয়। সফরে তার ব্যস্ততা থাকে তীব্র, সময় সংকীর্ণ হয়ে যেতে পারে- এসব সমস্যাকে সামনে রেখে চার রাকাতের ফরজ মুসাফিরের জন্য ৫০% ছাড় দিয়ে মাত্র দু'রাকাত করা হয়েছে। এ উদাহরণগুলো এ জন্য দিলাম যাতে এটা পরিষ্কার হয় যে, সবকিছু বিবেচনা করে যেখানে যতটুকু বাধ্যবাধকতা ও সুযোগ সুবিধা ইসলাম মানুষকে দিয়েছে তার আলোকেই মানুষের কর্মধারা নির্ধারিত হয়। ইসলাম মানুষের জন্য যা কিছু বৈধ করেছে গোড়ামীর কারণে কেউ যেন তাকে অবৈধ আখ্যা না দেয়, আবার অবৈধকে বৈধ করার জন্য অযথা শরীয়তের ফাঁক ফোকড় না খুঁজে বেড়ায়। কারণ এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট না থাকলে ইসলামের শাশ্বত

www.icsbook.info

মূল্যমান উপলব্ধি করা কঠিন হবে। মানুষের সামগ্রিক কর্মধারা নির্ধারণে এ শাশ্বত মূল্যবোধগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত: সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এসব বিষয় পরিষ্কার না থাকলে সমূহ বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

সংস্কৃতি

ক. "সংস্কৃতি" শব্দটি সংস্করণ বা সংস্কার বিশেষ্য পদ থেকে গঠিত। 'সংস্করণ' অর্থ বিশোধন, সংশোধন। 'সংস্কার' অর্থ শুদ্ধিকরণ, শাস্ত্রীয় নীতিমালা ও অনুষ্ঠানাদি দ্বারা পবিত্রকরণ, শোধনকরণ বা পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধারকরণ, পরিষ্কার বা নির্মলকরণ, অলংকরণ, প্রসাধন, উৎকর্ষ সাধন, উন্নতি বিধান, মেরামতকরণ। অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, রীতিনীতি ও মার্জিত আচার-আচরণ ইত্যাদির উৎকর্ষ হচ্ছে কৃষ্টি বা Culture এর বিশেষণ। 'সংস্কৃত' শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন বস্তু বা বিষয় যা সংস্কার করা হয়েছে, শ্রীমন্ডিত, সজ্জিত ও অলংকৃত করা হয়েছে। কৃষ্টিও সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কর্ষণ (অর্থ ঘর্ষণ) থেকে-এর উৎপত্তি। 'অনুশীলন'ও এর এক অর্থ।

খ. সংস্কৃতি সাধারণত: তাহযীব, তমুদ্দুন বা ইংরেজী কালচারের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় সংস্কৃতি শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর শাব্দিক অর্থের প্রতি তাকালেও সংস্কৃতির উপরোল্লেখিত সংজ্ঞায় বিবৃত ভাবেরই প্রতিনিধিত্ব ও পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন:

১। Culture (কালচার) অর্থ- কর্ষণ করা, চাষ করা, অনুপযুক্ত জমিকে যেমন কর্ষণ ও চাষের দ্বারা মসৃণ ও ফসলোৎপাদনের উপযোগী করা হয়, তেমনি সদাচরণের কর্ষণ ও চাষের অনুশীলন, পরিশীলিতকরণের দ্বারা একটি ব্যক্তি বা জাতির আচার-আচরণ অপরের চিত্তের কাছে গ্রহণ বা উপভোগের উপযোগী হয়। তার সদাচরণমন্ডিত ক্রিয়াকর্ম হয় তখন অপরের কাছে প্রশংসিত ও তার পরিচয় নির্দেশক। এ কারণেই চাষকৃত উপযুক্ত জমিকে যেমন Cultured land বলা হয়, তেমনি মানুষের উপযুক্ত, সুন্দর, মার্জিত ও পরিশীলিত আচার-আচরণের জন্য তাকে বলা হয় Cultured man or cultured nation.

২। আরবী 'সাকাফাহ্" অর্থ- সফল হওয়া, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাওয়া। শিক্ষার মাধ্যমেই সফলতা আসে। কোন ব্যক্তি-মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও কর্মানুষ্ঠান যখন অপরের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে ধরা দেয়, ঐ মানুষটিকে তখন আরবী সমাজে বলা হয় (মুসাক্কাক) অর্থাৎ সংস্কৃতিবান, শিক্ষিত।

www.icsbook.info

৩। উর্দূ 'তমদ্দুন' শব্দটি 'মদীনা', 'মুদান' বা 'নগর', 'শহর' থেকে গঠিত। নগরজীবন ও শহরজীবনের ধারা ও চিন্তা-চেতনা যেহেতু গ্রামীণ জীবনধারা ও চিন্তা-চেতনার তুলনায় অনেক দিক থেকে পরিশীলিত ও মার্জিত হয়ে থাকে, তাই নগর-সভ্যতা, নগর-কৃষ্টি ও আচার-আচরণ আশ্রিত জীবনাচার তমদ্দুন কিংবা তাহযীব-তমদ্দুন রূপে খ্যাত। তাহযীব শব্দের অর্থ হচ্ছে সজ্জিতকরণ। যে ব্যক্তি বা সমষ্টি আপন চিন্তা চেতনা ও জীবনধারার মধ্য দিয়ে নিজেকে সজ্জিত, নন্দিত, পরিশীলিত ও সমাদৃত করে উপস্থাপন করতে পারে তাকে বলা হয় সংস্কৃতিবান ও সভ্য।

সৃষ্টির সেরা মানুষ। তার এই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা বজায় রাখা ও এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তার প্রয়োজন সংস্কৃতির। সংস্কৃতি মানুষেরই আছে- অন্য জীবের সংস্কৃতি বলে কিছুই নেই। মানুষ হিসেবে মানুষের আসল পরিচয়ই তার সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির ভুল ধারণা

শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়কে সাধারণত সংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও আসলে এইগুলো ঠিক সংস্কৃতি নয়; বরং সংস্কৃতির বাহন মাত্র। মানব মনের অন্তর্নিহিত শক্তি, কৌতূহল ও প্রতিভা স্বত:স্ফূর্ত বিকাশ লাভ করে সংস্কৃতির মাধ্যমে। সংস্কৃতিকে শুধু কিছু রীতিনীতি কিংবা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। কিংবা শুধু চিন্তা-চেতনা, কল্পনা ও ধ্যানের মধ্যেও আবদ্ধ রাখা যায় না। আবার ঘর, বাড়ি-গাড়ী এবং ধন-দৌলতের মধ্য দিয়েও সংস্কৃতির পরিচয় ফুটে উঠে না। সংস্কৃতি সমাজ দেহের শুধু লাবণ্য ছটা নয়, তার সমগ্ররূপ। এ জন্যই সংস্কৃতির মাধ্যমে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে। খন্ড খন্ড কিংবা আংশিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড কখনও মানুষকে তার মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করতে পারে না।

সংস্কৃতির স্বরূপ

ক. সংস্কৃতির বস্তুগত, বিশ্বাসগত এবং নন্দনগত তিনটি স্বরূপ বিদ্যমান। বস্তুগত সংস্কৃতি বলতে মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট উপকরণকেই বুঝান হয়। বিশ্বাসগত ক্ষেত্রে ধর্মীয় আদর্শ কিংবা বিভিন্ন মতাদর্শকে বুঝান হয়। আর নন্দনগত সংস্কৃতি হচ্ছে তাই, যা মানুষের মনে রসবোধের জন্ম দেয়। যেমন- শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি।

আমরা খাবার খেয়ে থাকি। এখন এই খাবার ভাত-রুটি হতে পারে, আবার মাছ-গোশতও হতে পারে। এই খাবার খেয়েই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়; কিন্তু এই ভাত-রুটি বা মাছ-গোশত খাওয়াটাই সংস্কৃতি নয়। সংস্কৃতি হচ্ছে খাবারের পদ্ধতি। আমরা যে পদ্ধতিতে খাবার গ্রহণ করব, সে পদ্ধতিটাই হচ্ছে সংস্কৃতি।

www.icsbook.info

অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে জীবন পরিচালনার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার নাম।

খ. সংস্কৃতির সাথে জীবন দর্শনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। জীবন দর্শনের ভিত্তিতেই মানুষের চিন্তা-চেতনা আবর্তিত হয় এবং তার ভাব ও ক্রিয়াকর্মের অভিব্যক্তি ঘটে। এই জাগতিক জীবন সম্পর্কে তার ধারণা এবং এখানে মানুষের দায়িত্ব ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই জীবন সম্পর্কিত তার এই বিশেষ ধারণা বদ্ধমূল হয়। জীবনের ব্যাপারে মানুষের এই ধারণা এবং জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে সংস্কৃতির উপাদান। মানুষের কর্মক্ষমতা তার চিন্তাশক্তিরই অধীন থাকে। তার মনের ভাবানুভূতিই তার হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সক্রিয় করে তোলে। তাই যে কোন সংস্কৃতি মূলত: তার আকীদা-বিশ্বাসেরই ফল।

এখানেই আমাদের ফিরে তাকাতে হয় মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্যের দিকে। সংস্কৃতি শুধু মানব জাতির জন্য। পশু সমাজের জন্য সংস্কৃতি নয় এবং সংস্কৃতি কোন খন্ডিত বিষয়ও নয়। সংস্কৃতি মানুষের জীবনের রূপ-কাঠামোকে তুলে ধরে, যার দ্বারা মানুষ তার নিজের পরিবেশ উন্নতকরণ ও সুন্দর ভবিষ্যত রচনায় সক্ষম।

সংস্কৃতির এই বাহ্যিক রূপকাঠামোটাই কিন্তু সবকিছু নয়। জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য এটা একটা কর্মপদ্ধতি মাত্র। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, মানুষের জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্যের উৎকর্ষ বা কর্ষণ করাই সংস্কৃতির কাজ। এভাবেই একটি জীবন পূর্ণতা বা সফলতা লাভ করে।

জীবনের এই পূর্ণতা লাভের জন্য অর্থাৎ একটি সুস্থ, সুন্দর সৎ ও পরিচ্ছন্ন জীবন গড়ে তোলার জন্যই প্রয়োজন জীবন-বোধ বা দর্শন। অতএব গোড়াতেই জীবনদর্শন বা জীবনবিধান ঠিক করে নেয়া প্রয়োজন। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, কোন জিনিস ব্যবহারের ব্যাপারে তার স্রষ্টা যে পদ্ধতি নির্দেশ করেন, সেই জিনিস ব্যবহারের সেটাই সর্বোত্তম ও নির্ভুল পন্থা। এ জন্যই মানব রচিত কোন জীবনাদর্শ দিয়ে শুদ্ধ সংস্কৃতির সন্ধান লাভ সম্ভব নয়। শুদ্ধ সংস্কৃতি পেতে হলে আমাদের যেতে হবে খোদায়ী দর্শনের কাছে। যেতে হবে তাঁর দর্শনের কাছে- যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, জীবন দিয়েছেন, আহার যোগাচ্ছেন এবং একদিন আবার তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

গ. জীবনধারণের জন্য নানা উপকরণ কিভাবে ব্যবহার করা হবে, তা নির্ভর করে ব্যক্তির ধর্মীয় বা আদর্শগত বিশ্বাসের ওপর। অর্থাৎ মানুষের জীবনের কর্মপদ্ধতি কি হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে তার আদর্শিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এক কথায় বলা যায়, সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হল বিশ্বাস। বিশ্বাসই মানুষের মনের উৎকর্ষ বা কর্ষণ করে থাকে, যার মাধ্যমে মানুষ তার মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। আর এই মানবীয় গুণাবলীর বিকাশের পর্যায়টাকে

www.icsbook.info

আখ্যায়িত করা হয় সংস্কৃতির নামে। সংস্কৃতির পরিভ্রমণ তাই বিশ্বাস-এর আবর্ত-রেখা বরাবরে। 'বিশ্বাস'-এর দৃঢ়তাই সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে।

যারা বিশ্বাসী তাদের ব্যক্তি জীবন এবং সামাজিক জীবন ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশ্বাস হচ্ছে একটি চিরন্তন উপলব্ধি- এর অবক্ষয় নেই, পরিবর্তন নেই। বিশ্বাসের বলেই মানুষ চরিত্রবান হয় এবং আদর্শবাদী হয়। এই বিশ্বাস-ই ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে।

সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসের একটি কার্যকর ভূমিকা আছে। তবে বিশ্বাসের মধ্যেও তারতম্য রয়েছে। একেশ্বরবাদীদের বিশ্বাস এক রকম, আর বহু দেবতার আরাধনা যারা করেন তাদের বিশ্বাস অন্য রকম। কোন কোন ধর্মে ঈশ্বরকে মানবরূপে আবির্ভুত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন খ্রীষ্টানরা যীশুখৃষ্ট বা হযরত ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে থাকেন এবং তাদের সকল ধর্মীয় প্রার্থনা যীশুর প্রতি নিবেদিত, আল্লাহর প্রতি নয়। হিন্দুরা আবার বহুবিধ দেব-দেবীদের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। আবার বৌদ্ধরা কোন প্রকার বিশ্বাসের কথা বলেন না। তাঁরা বলেন যে, মানুষ তাদের কর্মের মাধ্যমে নির্বাণের পথে অগ্রসর হয় এবং নির্বাণ লাভের জন্যই তারা সদা-সর্বদা সতর্ক থাকবেন। এ নির্বাণ লাভের উপায় হচ্ছে পঞ্চশীল পালন করা এবং মানব হিতৈষণীয়রূপে নিজেদের নিযুক্ত রাখা। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের এ পার্থক্য তাদের জীবনাচরণ এবং সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাদের খাদ্য গ্রহণে, আচার-আচরণে এবং পরিচ্ছন্নতা-অপরিচ্ছন্নতা জ্ঞানের মধ্য দিয়ে তাদের সংস্কৃতির পার্থক্য প্রকাশিত হয়। প্রকাশ্য ধর্মীয় আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির জীবন দর্শনের প্রকাশ ঘটে। হিন্দুদের দোল উৎসব, দূর্গা পূজা, কালী পূজা ইত্যাদি, খ্রীষ্টানদের বড়দিন উৎসব এবং মুসলমানদের ঈদ এবং মহররম উৎসব এক স্বভাবের এবং প্রকৃতির নয়। এ উৎসবগুলো সংস্কৃতির তাৎপর্যকে প্রকাশ করে। জীবন দর্শন তথা বিশ্বাসের এ পার্থক্যই মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিক বিভাজন সূচিত করে।

ইসলামী সংস্কৃতি

ক. বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী বলেছেন, " সাহিত্য শুধু পরিচ্ছন্ন ও শ্লীল হলেই ইসলামী সাহিত্য হয়না, বরং ইসলামী মতাদর্শের ওপর ভিত্তিকৃত হলেই তা ইসলামী সাহিত্য।" সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমানভাবে প্রযোজ্য। যে সংস্কৃতি ইসলামী মতাদর্শের ওপর ভিত্তিকৃত এবং মানুষের মনে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি, সংরক্ষণ এবং উজ্জীবনের সহায়ক তাই ইসলামী সংস্কৃতি। যে জিনিসকে ইসলাম সঠিক বলে ইসলামী সংস্কৃতি তার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে এবং ইসলামের কাছে যা

www.icsbook.info

বাতিল ইসলামী সংস্কৃতির কাজ হচ্ছে তার প্রতি মানুষের বিরাগ সৃষ্টি করা।

কোন জাতির বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনার বিশেষ গুণান্বিত আঙ্গিকের পরিশীলিত ব্যবহারিক বহি:প্রকাশকেই সংস্কৃতি বলে। ইসলামী জীবন দর্শনের আলোকে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়, সেই ফলিত সংস্কৃতিই মূলত: ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধসমূহ সক্রিয় থাকবে। তথা সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি ইসলামী ভাবধারার পরিচায়ক হবে। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামের মৌল বিশ্বাসের ভিত্তিতে যত নিয়মাবলী, বিধিব্যবস্থা পালনীয়, এগুলোই ইসলামী সংস্কৃতি- যাকে 'দ্বীন' বলা যায়। বস্তুত: এই দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের পরিপূর্ণ রূপায়নের যে আচরিত রূপ তাই ইসলামী সংস্কৃতি।

খ. ইসলামী জীবন চেতনা ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোন সংস্কৃতির নাম আর যাই হোক না কেন সেটা ইসলামী সংস্কৃতি নয়। কোন জাতির সংস্কৃতি তার পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যকে অপরের কাছে তুলে ধরে। যেই জাতির যেই জীবন দর্শন ও আকীদা-বিশ্বাস তার সংস্কৃতিতে সেটাই প্রতিবিম্বিত হয়। এ কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি বিভিন্ন। আর সেই বিভিন্নতার দরুণই অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি থেকে মুসলিম সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানরা অপরের সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নিলেও সেটি কেবল ঐসব ক্ষেত্রেই সীমিত, যা তাদের জীবনবোধ, জীবন চেতনা, আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কোথাও এই নীতিবিচ্যুতি ঘটার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন বিজাতীয় সংস্কৃতি প্রাধান্য পেলে সেটাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা যাবে না। কারণ কোন সংস্কৃতি কোন মুসলমান চর্চা করলেই সেটা ইসলামী সংস্কৃতি হয়ে যায় না। ইসলামী জীবনবোধের বিপরীত ভাবাদর্শজনিত কোন আচার-আচরণ ও কৃষ্টি সংস্কৃতি কোন মুসলিম সম্প্রদায়ে পরিদৃশ্যমান হলে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ সেটাকে আখ্যায়িত করেছেন 'বেদায়াত' বলে। 'তাশাববুহ বিল কাওমিল আখের' বা 'অপর জাতির ধর্মবিশ্বাসজনিত কাজের সাথে সাদৃশ্য' বলে সেটিকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মহানবী (সা.) কঠোরভাবে নিষেধ করে বলেছেন: "কেউ অপর জাতির (বিশ্বাসজনিত কাজ ও আচার-আচরণের) অনুকরণ করলে সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।" যেমন খ্রীষ্টানরা কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর উক্তির পরিপন্থী এটা বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে ক্রুশবিদ্ধ করে মারা হয়েছে। তাই সেটির অনুকরণে তাদের ক্রস চিহ্ন গলায় পরিধান করা, তা বাসভবনে রাখা বা গৃহের প্রাচীরগাত্রে কিংবা চিকিৎসা হাসপাতালে অথবা অন্য কোন দাতব্য কর্মকান্ড

www.icsbook.info

বা গলার নেকটাইতে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করাকে তারা তাদের সংস্কৃতির অঙ্গে পরিণত করে নিয়েছে বিধায় কোনো মুসলমান কর্তৃক সেটার ব্যবহার আপত্তিকর। খ্রীষ্টানগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থার সেবাধর্মী মানবিক কাজকর্মসমূহকে মুসলমানগণ সমর্থন করলেও তাদের ধর্মবিশ্বাসসঞ্জাত সংস্কৃতির অঙ্গ ক্রশ চিহ্নের ব্যবহারকে তারা এজন্য অবৈধ মনে করে এবং নিজ দেশের এই সেবা সংস্থার চিকিৎসা সেবাধর্মী কাজের প্রতীক হিসাবে মুসলমানরা 'হেলাল-এ আহমার' বা রেডক্রিসেন্ট ব্যবহার করে থাকে। এভাবেই ইসলামী সংস্কৃতি তার আপন স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে ও বজায় রাখে।

কিন্তু কোথাও যদি এ স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত না হয় এবং মুসলমানদের অবহেলা ও অসতর্কতার সুযোগে মুসলিম সমাজে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে তা দীর্ঘদিন যাবত চর্চিত হতে থাকে, তখন তাকেও ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গ মনে করা হতে পারে। যেমন, মুসলিম রাজা বাদশাহদের দরবারের অনেক কাহিনী আমাদের সমাজে প্রচলিত, যার সাথে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সংস্কৃতির কোন পার্থক্য নেই। বিশেষত: মোগল ও বাগদদের রাজতান্ত্রিক মুসলিম বাদশাহের দরবারী সংস্কৃতি। কালক্রমে এ সব সংস্কৃতি মুসলিম সংস্কৃতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এ সব সংস্কৃতির সাথে ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধের বিস্তর পাথর্ক্য বিদ্যমান। এ সংস্কৃতি কিছুতেই ইসলামী সংস্কৃতি হতে পারেনা। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, মুসলমান কোন সংস্কৃতি চর্চা করে আসছে বলেই তা ইসলামী সংস্কৃতি পদবাচ্যের অধিকারী হয়ে যায় না। সেই সংস্কৃতি ইসলামী জীবন দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিশ্বাসসঞ্জাত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ইসলামী মূল্যবোধের অনুকূল বা অন্তত ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন সংস্কৃতিই কেবলমাত্র ইসলামী সংস্কৃতি অভিধায় অভিহিত হতে পারে।

গ. ভৌগলিক এলাকার আবহাওয়া ও পরিবেশগত পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন জীবনাচার আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্রের এক অনুপম নিদর্শন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বার বার একথা ঘোষণা করেছেন যে, ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্রের নিদর্শন। জীবনাচারের এ পার্থক্যের ফলে স্বাভাবিকভাবেই অঞ্চল ভেদে পৃথক পৃথক সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে। মানুষ স্থানীয়ভাবে বিকশিত এ সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এ স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবে কিছু কিছু ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির লোকজন পারস্পরিক বিভেদ ভুলে একই ধরনের আচরণ করে থাকে। যেমন শীত প্রধান অঞ্চলের জনসাধারণ স্বাভাবিক ভাবেই শীত প্রতিরোধক পোশাক পরিধান করে। এ ক্ষেত্রে ধর্ম বর্ণের পার্থক্য কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

মরুভূমি অঞ্চলের জীবনাচারের সাথে বন্যাতাড়িত অঞ্চলের মানুষের জীবনাচার

www.icsbook.info

এক হবে না এটাই স্বাভাবিক। এর ফলেই এ দু'অঞ্চলের সংস্কৃতির মধ্যে একটা পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে বিশ্বব্যাপী স্থানে স্থানে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে ইসলামের সম্পর্ক কেমন হতে পারে সংস্কৃতি চর্চার বেলায় তাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ইসলাম কি স্থানীয় সংস্কৃতিকে বাতিলযোগ্য বলে ঘোষণা দেয় নাকি নির্বিশেষে স্থানীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নেয়- এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে সামনে রেখেই। ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি যে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত- স্থানীয় সংস্কৃতির যে অংশটুকু এ মৌল বিশ্বাসের অনুকূল, ইসলাম সেটুকু তার নিজের সংস্কৃতির সাথে একীভূত করে নেয়।

দ্বিতীয়ত: যে অংশটুকু এ মৌল বিশ্বাসের অনুকূল নয় আবার প্রতিকূলও নয়, সে অংশটুকু অর্থাৎ এ মৌল বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেটুকুকেও ইসলাম তার নিজের সংস্কৃতির মধ্যে স্থান দেয়। অর্থাৎ সংস্কৃতির কোন অংশ ইসলামের অনুকূল হোক বা না হোক কেবলমাত্র ইসলামের সাথে বিরোধহীন হলেই সেটুকু ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে শামিল হতে পারে। এ উদারতার কারণেই ইসলাম খুব দ্রুত বিশ্বব্যাপী বিস্তারিত হতে পেরেছে।

তৃতীয়ত: স্থানীয় সংস্কৃতির যে অংশটুকু ইসলামী বিশ্বাস ও চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক, অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর বিপরীত- সে অংশটুকু ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাওহীদের পরিবর্তে যা শিরকিয়াতকে উৎসাহিত করে, রিসালাতের ধারণাকে বিকৃত বা ভুলুণ্ঠিত করে এবং সর্বোপরি আখেরাতমূখী চেতনার পরিবর্তে ভোগবাদী চেতনার বিস্তার ঘটায়- ইসলাম সংস্কৃতির সেসব কাজকে অনৈসলামিক সংস্কৃতি বিবেচনা করে। ইসলামে এ অপসংস্কৃতির চর্চা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মানুষের জীবনকে অপসংস্কৃতির কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলামী সংস্কৃতি নিরন্তর প্রচেষ্টা চালায়।

গ্রাম বাংলায় ধান-দুর্বা দিয়ে বধুর বরণ করার রেওয়াজ কোথাও কোথাও দেখা যায়। এ ধান-দুর্বাকে নতুন বর বধুর সৌভাগ্যের প্রতীক কল্পনা করা হয়। এটি এক ধরনের শেরেকি ধারণা। কারণ ধান-দুর্বা দিয়ে বধু বরণ করলেই নবদম্পতি সৌভাগ্যের সাগরে হাবুডুবু খাবে এমন ধারণা আল্লাহ যে একমাত্র সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের মালিক এ ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। ফলে এ ধরনের শেরেকি সংস্কৃতি ইসলামে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। কিন্তু কৃষি প্রধান এ দেশে নতুন ধান এলে খুশীতে যদি কৃষকরা আনন্দে মেতে ওঠে সে আনন্দে শরীক হতে ইসলামে বাধা নেই। এভাবেই ইসলামী সংস্কৃতি স্থানীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ বা বর্জন করে।

www.icsbook.info

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার স্বরূপ

ক. ইসলাম পৃথিবীতে নিছক রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধনের জন্য আসেনি। ইসলাম এসেছে মানুষের চিন্তা ও কর্মকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। মানুষের চিন্তা ও কর্মের এ পরিশুদ্ধির প্রচেষ্টাকেই বলা যায় সামগ্রিক অর্থে সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

মানুষের আচার ব্যবহার থেকে শুরু করে জীবনের সামগ্রিক কর্মকান্ড যে বিশেষ প্যাটার্নে গড়ে তোলার জন্য ইসলাম প্রচেষ্টা চালায়- সত্যিকার অর্থে সে বিশেষ প্যাটার্নে জীবনটি গড়ে না উঠা পর্যন্ত তা বিশুদ্ধ ও সংস্কৃতিবান হতে পারে না। কারণ ইসলমাই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ফলে ইসলাম ছাড়া জীবন পরিচালনা মানেই হচ্ছে, অপূর্ণাঙ্গ বিধান দ্বারা পরিচালিত হওয়া। আর অপূর্ণাঙ্গ বিধান দ্বারা জীবন পরিচালনার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে অসঙ্গতি ও ত্রুটিপূর্ণ জীবন যাপন করা। স্বাভাবিকভাবেই এ জীবন অসংস্কৃত বা অপসংস্কৃতির শিকার হতে বাধ্য। এ জন্যই বলা যায়, পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া ছাড়া পরিপূর্ণ সংস্কৃতিবান হওয়া সম্ভব নয়।

অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ইসলামের যে মূল দাবী মানুষের চিন্তা ও কর্মের সংস্কার ও পরিশুদ্ধি, সে সংস্কার ও পরিশুদ্ধি ছাড়া প্রকৃত অর্থে মুসলমানও হওয়া যায় না, সংস্কৃতিবানও হওয়া যায় না। তাই সংস্কৃতিবান হতে হলে প্রথমে মুসলমান হতে হবে আর মুসলমান হতে হলে সংস্কৃতিবান হতে হবে। কারণ সংস্কৃতির নিজস্ব কোন আদর্শ নেই। সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের আচরিত কর্ম প্রবাহের নাম। এ কর্ম প্রবাহ কোন্ আদর্শের নিরিখে সম্পন্ন হবে তার ওপর নির্ভর করে সংস্কৃতির স্বরূপ। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আদর্শের ভিত্তিতে এ কর্মধারা পরিচালিত হলে তা হবে সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ। এ জন্যই ইসলামহীন সংস্কৃতি মূলত: অপসংস্কৃতির নামান্তর।

খ. ইসলাম যেমন মানুষের চিন্তার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে তার কর্মে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে চায়- সংস্কৃতির ও টার্গেট তাই। মানুষের চিন্তা ও কর্মে একটি পরিচ্ছন্ন রূপ ফুটিয়ে তোলাই সংস্কৃতির মূখ্য কাজ। বিশ্বাস থেকেই যেহেতু মানুষ কর্মে প্রবিষ্ট হয়, তাই মানুষকে তার বাঞ্ছিত কর্মধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য বা টিকিয়ে রাখার জন্য সংস্কৃতি প্রচেষ্টা চালায়।

সংস্কৃতি কি তার জবাব দিতে গিয়ে পন্ডিতেরা বলেছেন- সংস্কার করা, পরিশুদ্ধ করা। এ সংস্কার হচ্ছে জীবনের সংস্কার, এ পরিশুদ্ধি জীবনের পরিশুদ্ধি। জীবনের অনতিপ্রেত চিন্তা ও কর্ম পরিত্যাগ করে সুস্থ সুন্দর শুদ্ধ জীবন যাপন করার নামই হচ্ছে সংস্কৃতি।

শেওলা পড়া, পলেস্তরা খসা, ভাঙাচুরা কোন প্রাসাদকে সংস্কার করা বলতে আমরা

www.icsbook.info

বুঝি প্রাসাদটির সকল অসংগতি দূর করে তাকে পুনরায় তার আসল চেহারায় ফিরিয়ে নেয়া, তাকে পুনরায় বসবাস উপযোগী করা। প্রাসাদটিকে তার আসল রূপ ও স্বমহিমায় ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হলেই আমরা বলি প্রাসাদটির সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আবার একটি প্রাসাদকে নিয়মিত ঝাড়পোছ করা, কোথাও রং উঠে গেলে সাথে সাথে সেটুকু ঠিক করে দেয়া এবং যখনি তাতে ছোটখাট কোন ক্রটি দেখা দেয় সাথে সাথে তা সারিয়ে তুলে প্রাসাদটিকে সতত: বাসযোগ্য রাখার কাজটিও সংস্কার কাজ। প্রতিনিয়ত সংস্কারের মাধ্যমেই প্রাসাদটি তার স্বমহিমায় টিকে থাকে। মানবজীবনের সংস্কারও এ স্থূল উদাহরণটিরই অনুরূপ। মানুষের নষ্ট জীবনকে শিষ্ট জীবনে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টাকেই বলে সংস্কৃতি। ইসলামের যেমন মূল টার্গেট পরিশুদ্ধ জীবন, পরিশুদ্ধ মানুষ- সংস্কৃতিরও মূল টার্গেট জীবনের এই পরিশুদ্ধ রূপ। এখানে এসেই ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়। পার্থক্য এটুকু, ইসলাম নিজে একটি আদর্শ আর ইসলামী সংস্কৃতি সে আদর্শের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার এক অনিবার্য হাতিয়ার।

গ. ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার স্বরূপ কি হবে এ এক গুরুতর প্রশ্ন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বাতিল যেভাবে এবং যেমনটি করছে ইসলামী আদর্শের ধারক বাহাকরাও কি সেভাবে এবং তেমনটি করবে? তারাও কি সেভাবে নাচবে, গাইবে, হাসবে, খেলবে? সেই একইভাবে একই ছন্দে জীবন যাপন করবে?

যদি সেভাবে এবং তেমনটি না করা হয় তবে সাংস্কৃতিক জীবন আকর্ষণহীন ও নিস্প্রভ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ আনন্দময় ভুবনের হাতছানিকে অগ্রাহ্য করে নিরানন্দময় জীবনকে বরণ করে নিতে ইচ্ছুক হবে না। কিন্তু যদি ইসলামের কমন ভ্যালুজকে অক্ষুন্ন না রেখে হুবহু বাতিলের মত সাংস্কৃতিক তৎপরতায় লিপ্ত হয় মুসলমানগণ, তবে আলাদাভাবে মুসলমানদের এ সাংস্কৃতিক তৎপরতা চালাবার কোন প্রয়োজন থাকে কি? তাহলে মুসলমানদের যে আলাদা কৃষ্টি-কালচার, আলাদা ইতিহাস-ঐতিহ্য আছে সেটিই বা প্রমাণ হবে কিভাবে? ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার স্বরূপ কি হবে এ দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে সামনে রেখেই তা নির্ণয় করতে হবে। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে এমন একটি পথ বের করতে হবে যেখানে একাধারে আনন্দময়তা ও শরিয়তের সীমারেখা উভয়ই বজায় থাকবে।

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার ভিত্তি

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। ইসলামের যে কমন ও অপরিহার্য মূল্যমান, যে বিশ্বাস ও আচরণ ইসলাম একজন মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে তার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে এমন কোন কিছু ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে শামিল হতে পারে না।

www.icsbook.info

মানুষের জন্য হালাল-হারামের যে বিধান ইসলাম দিয়েছে, যে সব কাজকে ইসলাম অবশ্য পালনীয় ও বর্জনীয় বলে ঘোষণা করেছে, যে কোন মূল্যে সে সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করেই ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে। এ সীমারেখাকে অবহেলা করে বা কৌশলের নামে তাকে অবজ্ঞা করে যা করা হবে তা আর যাই হোক ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

প্রধানত: তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ইসলামী সংস্কৃতির প্রাসাদ নির্মিত হয়। বিষয়গুলো হচ্ছে: ১. তাওহীদ। ২. রিসালত। ৩. আখিরাত।

তাওহীদ

তাওহীদ হচ্ছে ঈমানের বুনিয়াদ। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এটুকু বিশ্বাস করাই তাওহীদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। রাসূলের জামানায় তৎকালীন আরব মুশরিক এবং কাফেররাও এটুকু বিশ্বাস করতো। তাওহীদে বিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তিনিই মানুষের রিজিকদাতা, পালনকর্তা এবং একমাত্র অভিভাবক। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর ইবাদতের জন্য- আর দুনিয়ার সব কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। ভয় একমাত্র তাকেই করতে হবে- সাহায্য চাইতে হবে তারই কাছে। মানুষের ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সব তার হাতে।

মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য তিনি যে বাণী পাঠিয়েছেন, যে বাণী লিপিবদ্ধ আছে পবিত্র কোরআনে- জীবন পরিচালনা করতে হবে সে কোরআনের আলোকে। কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। এ ইবাদত নিছক কিছু আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়- মানুষের জীবনের প্রতিটি কর্মই ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যদি তা সাধিত হয় ইসলামের বিধি-বিধান মোতাবেক। নামায যেমন একটি ইবাদত- তেমনি নামায শেষে রিজিকের সন্ধানে পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ার জন্য আল্লাহ যে তাকিদ করেছেন, সে তাকিদের কথা স্মরণ রেখে হালাল পথে উপার্জন করাও একটি ইবাদত। তেমনি ইবাদত পরিবার প্রতিপালন এমনকি স্ত্রী সহবাস পর্যন্ত। কারণ আল্লাহ স্ত্রীর হক আদায় করার জন্যও তাকিদ করেছেন। কিন্তু যখন কেউ এ হালাল পথ পরিত্যাগ করে অন্য কোন পন্থায় যৌবনের চাহিদা মেটায় তখনই তা হারাম হয়ে যায়।

এমনিভাবে আল্লাহর যাবতীয় গুণগরিমা, বৈশিষ্ট, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করা এবং তার যাবতীয় হুকুম আহকাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার জন্য সর্বদা সজাগ সতর্ক থাকার নামই তাওহীদ বিশ্বাস। এ বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য আসা মানে হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য থেকে সরে দাঁড়ানো। কোন অবস্থাতেই এ বিশ্বাসে

www.icsbook.info

শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষের মনে এ তাওহীদ বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে হবে। শয়তান বিরামহীনভাবে এবং প্রতি মুহূর্তে মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করতে সচেষ্ট। এ জন্য ইসলামী সংস্কৃতির চর্চাও হওয়া উচিত বিরামহীন ভাবে এবং প্রতিনিয়ত। ইসলামী সংস্কৃতিকে এ ক্ষেত্রে দ্বিবিধ ভূমিকা পালন করতে হবে। এক, তাওহীদের এ চেতনায় যেন কোন প্রকার শিথিলতা আসতে না পারে তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। দুই, তাওহীদের এ চেতনা যেন দৃঢ় আস্থার ওপর দাঁড়াতে পারে এবং উত্তরোত্তর এ চেতনা তীক্ষ্ণ, সজীব ও বৃদ্ধি পায় তার জন্যও সচেষ্ট হতে হবে। অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রতিটি মুসলমানকে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তাওহীদের চেতনায় বিন্দুমাত্র শিথিলতা আনতে পারে এমন কোন কিছুকে সংস্কৃতির নামে আদৌ কোন প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

রিসালাত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ এবং সর্বশেষ নবী। মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাকে দ্বীন ও হেদায়েতসহ পাঠিয়েছেন। তিনিই মানব জাতির একমাত্র আদর্শ নেতা ও শিক্ষক। তাঁর নেতৃত্ব ও শিক্ষার বিপরীত কোন কিছু মানবতার জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাঁর নেতৃত্ব ও শিক্ষার বিপরীত সকল নেতৃত্ব বাতিল যোগ্য।

ইসলাম পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে: 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর আল্লাহর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের।' অর্থাৎ রাসূলের নেতৃত্বের বিপরীত নেতৃত্বকে বাতিল করার সাথে সাথে কোন্ নেতৃত্বের আনুগত্যের ছায়ায় জীবন কাটাতে হবে তাও পরিষ্কার করে বলেছে ইসলাম। তাই কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি যুগেই মুসলমানদের সে যুগের ইসলামী নেতৃত্বকে বরণ করে নিতে হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

ইসলামী সংস্কৃতির কাজ হলো মানুষের মনে রাসূলের নেতৃত্বের বিপরীত পৃথিবীর অন্য কোন নেতৃত্বের প্রতি যেন কারো মোহ সৃষ্টি না হয় মানুষের মনকে সেই উপলব্ধিতে উজ্জীবিত রাখা। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নেতৃত্বসহ অন্য সকল অনৈসলামিক নেতৃত্বকে অস্বীকার করার মত মনের জোর মানুষের মনে জাগিয়ে তোলা এবং তাকে জাগরুক রাখা। আদর্শ নেতা হিসাবে রাসূল (সা.)কে হৃদয়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা।

আখিরাত

মানুষকে এ দুনিয়ায় আল্লাহ পাঠিয়েছেন তার ইবাদত করার জন্য। একদিন এ দুনিয়ার জিন্দেগী শেষ হয়ে যাবে। মানুষকে পুনরায় ফিরে যেতে হবে আল্লাহর

www.icsbook.info

দরবারে। যিনি আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করবেন, পরকালে তিনি অত্যন্ত কল্যাণ ও সুখময় জান্নাত লাভ করবেন. তবে যে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করবে না তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অনন্ত আজাব।

জীবনের প্রতিটি কাজে মানুষকে তাই ভাবতে হবে যে কাজটি আমি করছি তা কি পরকালে আমার নাজাতের ওসিলা হবে, নাকি তা আমার জন্য বয়ে আনবে জাহান্নামের কঠিন আজাব।

আখিরাতের এ চিন্তা মানুষকে সকল পাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। সদা সর্বদা এ চিন্তা স্মরণে থাকলে মানুষের পক্ষে অন্যায় ও পাপ কাজ করা সত্যিই কঠিন। সুযোগ-সুবিধা এবং সামর্থ থাকার পরও শুধুমাত্র এ একটি কারণেই মানুষ সব খারাপ কাজ থেকে নিজকে দূরে রাখতে যে সচেষ্ট হয়- তার অসংখ্য নজির ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

ইসলামী সংস্কৃতির কাজ হচ্ছে মানুষের দীলকে সর্বদা আখিরাতমুখী করা। সংস্কৃতির বিভিন্ন তৎপরতার মধ্য দিয়ে বার বার আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই কেবল একটি কল্যাণময় ইসলামী সমাজের আশা করা যেতে পারে।

বস্তুত: ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার ভিত হচ্ছে এ তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত। যে সকল কর্মকান্ড মানুষকে এ মৌলিক চেতনার স্মরণ থেকে ফিরিয়ে রাখে তাই অনৈসলামিক সংস্কৃতি, আর যে সব তৎপরতার মধ্য দিয়ে এ সকল চেতনা জাগ্রত, শাণিত ও মজবুত হয় তাই ইসলামী সংস্কৃতি।

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা প্রয়োজন কেন এ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ এ প্রয়োজনীয়তার যথার্থ বোধ না জন্মালে সংস্কৃতি চর্চায় আমরা কখনোই নিবেদিতপ্রাণ হতে পারবোনা। এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারনা নিতে হলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাতিলের সাংস্কৃতিক হামলা আমাদের কি পরিমান ক্ষতি করছে তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। আধুনিক বিশ্বে ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে সাংস্কৃতিক হামলা তার অন্যতম। এ সাংস্কৃতিক হামলা মুসলমানদের জন্য কতটা ক্ষতিকর- সাধারণ মুসলমান তো দূরের কথা, ইসলামী আন্দোলনের অনেক কর্মীর কাছেও তা সুস্পষ্ট নয়। যেহেতু এ হামলার আঘাতটা প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক নয় বরং অনেকটা অন্তর্প্লাবী তাই সহজে তা সবার নজরে পড়ে না। তাই এ হামলা আমাদের কি ক্ষতি করছে তা একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

ক. বিশ্বব্যাপী বাতিল শক্তি মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে সবচেয়ে জোরালোভাবে যে কাজটি করছে তা হলো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এ এমন এক

www.icsbook.info

ভাইরাস যা এইডস-এর মত মারাত্মক এবং অতি দ্রুত তা সমগ্র সমাজ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে সমাজকে কলুষিত করে। স্বাস্থ্য সংক্রামক নয়- সংক্রামক হচ্ছে রোগ। এ জন্যই এ রোগ মুসলিম সমাজে দ্রুত সংক্রামিত হতে পারে। কোন মুসলমান এ হামলার শিকার হলে প্রথমে তার ঈমান দুর্বল হয়। ঈমান দুর্বল হলে আমল কমে যায়। কমতে কমতে এক সময় বন্ধ হয়ে যায় তার ইসলামী আমল। ফলে কখন যে মৃত্যু ঘটে তার মুসলমানিত্বের- সে কথা সে বুঝতেও পারে না।

খ. সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মুসলমানদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ বিনষ্ট করার জন্য বাতিল শক্তি তার সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা মুসলমানদের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় করতে সচেষ্ট যে, দৃশ্যমান এ পৃথিবীর বাইরে আর কোন জগৎ নেই, নেই কোন জবাবদিহিতার অবকাশ। তাই "খাও দাও ফূর্তি কর" এ ভোগবাদী দৃষ্টির বিস্তার ঘটিয়ে মুসলমানদের চিরায়ত মূল্যবোধ বিনষ্ট করে দিচ্ছে তাদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। ইন্দ্রিয় সুখ ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকে মুসলমানদের মুখ্য টার্গেটে পরিণত করতে চাচ্ছে। এর ফলে অন্যান্য মূল্যবোধের সাথে বিনষ্ট হচ্ছে:

ক) আখেরাতের চেতনা। যে চেতনা মানুষকে পাপ ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত রেখে সমাজে পুত পবিত্রতার বিস্তার ঘটায়।

খ) নেতৃত্বের চেতনা। যে চেতনা সামাজিক বিশৃংখলা প্রতিরোধ করে সমাজ থেকে জুলুম, অন্যায় দূর করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

গ) তাওহীদের চেতনা। এ চেতনার অভাবে মানুষের মর্যাদাবোধ বিনষ্ট হয়। মানুষ নিজে না অন্য মানুষের প্রভু, না ভৃত্য। কিন্তু এ চেতনার বিলুপ্তি ঘটায় মানুষ কখনো অন্য মানুষের প্রভু হয়ে দাঁড়ায় আবার কখনো হয় অন্য মানুষের ভৃত্য। মানুষ একমাত্র আল্লার বান্দা এবং পরস্পর ভাই এ ধারণার বিলুপ্তি ঘটার ফলে সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। এর ফলে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব, মানুষের মর্যাদা, মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য এসব ধারণার অবলুপ্তি ঘটে এবং মানুষ পশুর স্তরে নেমে যায়।

বস্তুত: এর ফলে একজন মুসলমান তার ঈমানী চেতনা হারিয়ে ফেলে এবং সে এমন সব কাজ করতে থাকে যা একজন অমুসলমান তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না থাকার কারণে করে বসে। আর এ অবস্থা সৃষ্টি হলে মাথা গুণতিতে সে মুসলিম দলভুক্ত হলেও কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে সে আর মুসলমান থাকেনা। "মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্যে" এ বিশ্বাসে ঘাটতি ঘটলে এবং মানুষের বাস্তব জীবনে এ ইবাদতের ধারাবাহিকতা কার্যকর না থাকলে তার মুসলমান থাকা না থাকায় কিছু যায় আসে না।

গ. বাতিলের সাংস্কৃতিক হামলার লক্ষ্য মুসলমানদেরকে সত্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। তার মধ্যে শয়তানী গুণ বৈশিষ্ট সৃষ্টি করা। তার জীবনের উদ্দেশ্য থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তার জীবনকে ব্যর্থ করে দেয়া। এ ব্যর্থতা তার

www.icsbook.info

ইহকালকে অতিক্রম করে পরকাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। তাই বিংশ শতাব্দীতে মুসলমানরা বাতিলের যত রকম হামলার শিকার হচ্ছে তার মধ্যে এ সাংস্কৃতিক হামলাই তার জন্য সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘ. বর্তমানে বাতিলের এ সাংস্কৃতিক হামলা সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। অসংখ্য মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এ হামলা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতার ফলে নিত্য নতুন পথ ধরে এ হামলার প্রচন্ডতা কেবল বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হচ্ছে। সাংস্কৃতিক লেবাসে চোরাগুপ্তা হামলার অসংখ্য পথ আবিষ্কৃত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

রেডিও, টিভি, ভিসিআর, সিনেমা, নাটক, নানাধরনের পত্রিকা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল বিনিময়, সাহিত্য, ট্যুরিজম, ভিউকার্ড, ওয়াল পোস্টার, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান মালা, নারী স্বাধীনতার মোহময় শ্লোগানের আড়ালে অবাধ মেলামেশা পূর্ণ সামাজিকতা, বিউটি পার্লার, শিরক মিশ্রিত গৃহ সজ্জা সামগ্রীর বিস্তার, সিনে ও পর্ণো ম্যাগাজিন, সামাজিক অনুষ্ঠানমালায় ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী পরিবেশ বিস্তার, পোশাক, নিত্য নতুন বিলাস সামগ্রী উদ্ভাবন, শিকার, উৎসব ও মেলা, সকল প্রকার প্রচার, যোগাযোগ ও গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে বাতিল শক্তি তার সর্বগ্রাসী সাংস্কৃতিক হামলা পরিচালনা করছে। এমনকি অর্থনৈতিক অনুদান বা ঋণ, শিল্প ও কারিগরী চুক্তি, কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্য দিয়েও অপসংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে কার্পণ্য করে না বাতিল শক্তি।

ঙ. বাতিলের সর্বপ্লাবী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে মুসলমানরা যে একটি মর্যাদাবান জাতি, তাদের রয়েছে আলাদা কৃষ্টি-কালচার-ঐতিহ্য, বিশ্ব মানবতার নেতৃত্বদানের জন্য এবং মহত্ব ও মানবতার বিজয় ঘোষণার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, এ কথা অধিকাংশ মুসলমান আজ বিস্মৃত। বলা হয়ে থাকে পৃথিবীতে এখন শতকোটি মুসলমানের বাস। কিন্তু যে অর্থে একজন মানুষ মুসলমান হয় সে দায়িত্ববোধসম্পন্ন মুসলমান এর মধ্যে কয়জন? যে কেউ এ কথা স্বীকার করবেন যে, এ সংখ্যা নেহায়েতই নগন্য।

বাতিলের এসব সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও হামলা মুসলমানদের ঈমানী চেতনা কিভাবে এবং কতটা ধ্বংস করছে তার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ দ্বীনের প্রতি সামান্য মোহব্বত পোষণকারী যে কোন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছে এ হামলার বিরূপতা। যাদের মধ্যে ঈমানের সামান্যতম স্ফুলিংগও বর্তমান তারাই বেদনাদীর্ণ চিত্তে এ অবস্থা অবলোকন করে শিউরে উঠতে বাধ্য।

বাতিলের সাংস্কৃতিক ঘুমপাড়ানি গান মুসলমানদের এতটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, তাদের ঘর জুড়ে দাউ দাউ আগুন দেখেও সে আগুন নেভাতে যে তাদের উঠে দাঁড়াতে হবে সে কথা বুঝতে পারছে না অধিকাংশ মুসলিম। শতাব্দীর কাল ঘুমে বিভোর ওরা। ওদের সামনে যে নতুন শতাব্দীর সূর্যোদয় অত্যাসন্ন এবং দেশে

www.icsbook.info

দেশে যুগের মুয়াজ্জিন আযান হেঁকে চলেছে- নিদ্রাতুর জাতির খুব কম লোকই সে আযানের ধ্বনি শুনছে।

চ. একজন মুসলমানের সাথে একজন অমুসলমানের পার্থক্য এখানেই যে, মুসলমান যে ভাবে ও যেমনটি বিশ্বাস করে এবং সে চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে যেভাবে তার কর্মকে ঢেলে সাজায়- একজন অমুসলিম তেমনটি বিশ্বাস করে না এবং সে কারণে মুসলমানের মত তার কর্মকে ঢেলে সাজায় না। যদি একজন মুসলমান ও অমুসলমানের চিন্তা ও কর্ম একই রকম হয় তবে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে কি? যদি মুসলমানদের চিন্তা ও কর্মে কোন বিশিষ্টতা না থাকে এবং অমুসলমানের মতই হয় মুসলমানের কর্মধারা তবে তাকে মুসলমান হিসাবে আখ্যায়িত করার কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে? আমি বিশ্বাস করি, যে কোন যুক্তিবাদী মানুষ বিশ্বাস ও কর্মের এ পার্থক্যের কারণেই দু'জন মানুষের একজনকে মুসলমান ও অপরজনকে অমুসলমান বলতে বাধ্য হবেন।

বিশ্বাস ও কর্মের এ পার্থক্য সৃষ্টি হয় মানুষের জ্ঞানের কারণে। মুসলমান জানে কে তাকে সৃষ্টি করেছে, এ পৃথিবীতে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি এবং এ দায়িত্ব পালন না করার পরিণাম কি? মানুষ কোথা থেকে আসে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে আবার তারা কোথায় যায়? এ জানার কারণে তার ভেতর যে প্রত্যয় জন্ম নেয় তার আলোকে সে তার কর্মকে ঢেলে সাজায়। এ জ্ঞান সে পড়াশুনা করেও আয়ত্ত করতে পারে আবার শুনে বা দেখেও আয়ত্ত করতে পারে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিই হচ্ছে এ জ্ঞান আহরণের প্রধান ও উত্তম হাতিয়ার। মুসলমানরা এ হাতিয়ারে সমৃদ্ধ না থাকার কারণে মুসলমানিত্ব হারিয়ে দুনিয়াব্যাপী আজ সীমাহীন দুর্দশার শিকার।

ছ. উপরে যে ক্ষতির উল্লেখ করলাম প্রকৃত ক্ষতির তুলনায় এ ক্ষতি খুবই সামান্য। সাংস্কৃতিক হামলার অর্ন্তনিহিত ক্ষতির দিকটা একবার প্রত্যক্ষ করলে এর ভয়াবহতা দেখে যে কোন মুসলমান শিউরে উঠবে।

আমরা জানি বাতিলের সশস্ত্র হামলায় একজন মুসলমান জীবন দিলে ইসলাম তাকে শহীদের মর্যাদা দেয়। শহীদদের জন্যে রয়েছে আল্লাহর দরবারে বিশেষ মর্যাদা ও জান্নাত। আল্লাহর সন্তোষ লাভের মাধ্যমে জান্নাত প্রাপ্তিই একজন মুসলমানের জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য বলে বিবেচিত হয়। এদিক থেকে বাতিলের প্রত্যক্ষ আঘাতের কারণে দুনিয়ার জীবনে সে পরাজিত হওয়ার পরও তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় না। বরং এ ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই সে লাভ করে তার জীবনের চূড়ান্ত সফলতা। ফলে তার দুনিয়ার জীবনের পরাজয়ই হয়ে ওঠে তার চূড়ান্ত সফলতার সোপান। অপরদিকে বাতিলের সাংস্কৃতিক হামলার কারণে প্রতিদিন হাজার হাজার মুসলমান তার মুসলমানিত্ব হারাচ্ছে- মৃত্যু ঘটছে তাদের ঈমানী চেতনার। দুনিয়ার আদম শুমারিতে তাদেরকে মুসলমান হিসাবে উল্লেখ করা হলেও আল্লাহর খাঁটি

www.icsbook.info

বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য হারাচ্ছে তারা। হালাল হারামের কোন বাঁধন তাঁদেরকে পরিচালিত করে না। পাপ পূণ্যের ধার ধারে না বাস্তব কর্ম জীবনে এ সকল মুসলমান। আল্লাহর ফরমাবরদারীর পরিবর্তে নাফরমানিতে লিপ্ত হতে এসব মুসলমানরা মোটেই ভয় পায় না। আল্লাহর আদেশগুলো যেমন তারা অমান্য করে তেমনি নিষেধগুলো মেনে চলারও কোন প্রবণতা তাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট থাকে না। এ ধরনের মানুষদের জন্যই আল্লাহ পরকালে জাহান্নামের কঠিন আজাবের ভয় দেখিয়েছেন। কোরআনে বার বার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন: 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।' অথচ সাংস্কৃতিক হামলার শিকার ঈমনদারদের মৃত্যু ঘটে মুসলমানিত্বহীন অবস্থায়। অর্থাৎ সশস্ত্র হামলার শিকার মুসলমান ব্যক্তির জীবন যেখানে চূড়ান্ত অর্থে প্রকৃত সাফল্য লাভ করে সেখানে সাংস্কৃতিক হামলার শিকার মুসলমানের জীবন চূড়ান্ত অর্থেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ জন্যই সাংস্কৃতিক হামলা মুসলমানদের জন্য অন্য সকল হামলার চেয়ে অধিক মারাত্মক ও ক্ষতিকারক।

জ. মুসলমানদের সাংস্কৃতিক পরাজয় তাদেরকে আরো একটি ক্ষতির সম্মুখীন করে। সেটি হলো আল্লাহর অতিরিক্ত ক্রোধ তাদের ইহ ও পরকালীন জীবনে আপতিত হওয়া। একজন মনিব তার দুই বান্দাকে একটি কাজের ভার দিল। এদের একজন কিভাবে কাজটি করতে হয় তা জানে না এবং এ কাজটি করতে না পারলে মনিব কতটা রাগান্বিত হবে সে সম্পর্কেও তার কোন ধারণা নেই। অপর জন জানে কাজটি কিভাবে করতে হয় এবং এও জানে এ কাজ না করলে তার মনিব কতটা রাগান্বিত হবে। এদের দু'জনই যদি কাজটি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে প্রথমোক্ত জনের চাইতে দ্বিতীয় জনের ব্যর্থতায় মনিব অধিক রাগান্বিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। ঠিক তদ্রূপ মুসলমান জানে এ দুনিয়ায় তার কর্তব্য কি এবং এ কর্তব্য না করলে তার পরিণতি কি হতে পারে। অমুসলমান এ ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা রাখে না। ফলে, দ্বীনের দাবি পূরণ না করার কারণে আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি অধিক রুষ্ট হন এবং এ কারণে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করেন এবং পরকালীন জীবনে তারা অধিক কঠোর শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। মানব জীবনকে এ ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পন্ন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমনকি আধুনিক বিশ্বে মুসলিম মিল্লাতের যে অনগ্রসরতা তারও মূল কারণ ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার অভাব। ইসলামের মৌল বিশ্বাস ও চেতনার আলোকে মুসলমানগণ তাদের বিশ্বাস ও কর্মকে যতক্ষণ ঢেলে না সাজাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রহমত, বরকত ও কল্যাণ আশা করা বৃথা। আর আল্লাহর রহমত ও বরকত ছাড়া জীবনকে সার্থক ও সফল করার বিকল্প কোন মাধ্যম নেই।

www.icsbook.info

ইসলামী আন্দোলনে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব

ক. ইসলামকে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার অব্যাহত ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার নাম ইসলামী আন্দোলন। ইসলামী আন্দোলনের মুখ্য টার্গেট দুটি। ক) সমাজের সকল স্তরে অন্য সকল মতবাদ ও শক্তির ওপর ইসলামকে বিজয়ী করা। খ) সমাজে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণ করা। ইসলামী আকিদা ও আমল ধ্বংস হতে পারে এমন সব তৎপরতার গতিরোধ করা।

এ দুটো উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে রাজনীতির পাশাপাশি ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা প্রয়োজন। ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা ছাড়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণ করার আর কোন বিকল্প মাধ্যম নেই। প্রতিনিয়ত মানুষকে যদি ইসলামী আচার আচরণে অভ্যস্ত করে তোলা যায় তবেই সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ সমূহ টিকে থাকতে পারে। প্রতিনিয়ত ইসলামী আচার আচরণে অভ্যস্ত রাখার যে প্রক্রিয়া সে প্রক্রিয়াটিকেই বলা যায় ইসলামী সংস্কৃতি।

দ্বিতীয়ত: ইসলামকে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিজয়ী আসনে সমাসীন করতে হলে প্রথমেই সমাজের মানুষগুলোর ধ্যান ধারণা, চিন্তা ও কর্মকে ইসলামের আলোকে গড়ে তুলতে হবে। সমাজের মানুষগুলো সর্বস্তরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেই কেবল সে সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম বিজয়ী হতে পারে। মানুষের চিন্তা ও কর্মে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার মাধ্যম ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা যতটা জোরদার হবে মানুষ ততই ইসলামী অনুশাসন পালনে অভ্যস্ত হবে। তাই ইসলামের রাজনৈতিক বিজয় নির্ভর করে সাংস্কৃতিক সাফল্যের ওপর।

এ জন্য সাধারণ ভাবে সকল মুসলমানকে ইসলামী সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নিজেদের বিশ্বাস ও আচরণ এতটা পরিশুদ্ধ ও সংস্কৃত করতে হবে যেন সাধারণ মুসলমান এমনকি অমুসলমানরাও তাদেরকে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় এবং ইসলামী আন্দোলনের এক একজন কর্মীকে তারা নিজেদের মডেল হিসাবে গ্রহণ করে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এ পরিশুদ্ধ জীবন গড়ার হাতিয়ার হচ্ছে সংস্কৃতি।

খ. ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, আর দশটা মতবাদের মত যেন তেন প্রকারে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা তাদের টার্গেট নয়। ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ইসলামী কায়দায়। অন্যায়, অসত্য ও জুলুমের পথে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য ন্যায় অন্যায় বোধ বিসর্জন দিতে অনুমতি দেয় না ইসলাম। হককে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সতত: হকের পথে এটাই ইসলামের শিক্ষা।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরবের লোকেরা

www.icsbook.info

স্বেচ্ছায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব করেছিল। মহানবী (সা.) ইচ্ছা করলে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলাম কায়েমের পদক্ষেপ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি দাওয়াতের মাধ্যমে একদল লোককে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করে তাদের জীবন ধারায় এক অভাবিত পরিবর্তনের সূচনা করেন। অত:পর এ লোকগুলো যখন ইসলামী জীবনাচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো এবং অমুসলিমদের সাথে সুস্পষ্ট সাংস্কৃতিক পার্থক্য সূচিত করলো তখন তাদের নিয়ে তিনি মদিনায় এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দিলেন। এ রাষ্ট্রটি কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোত্তম মডেল হিসাবে বিবেচিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের এটাই পদ্ধতি, এটাই রাসূলের সুন্নত। এ পদ্ধতির খেলাফ কোন পদ্ধতিতে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে না। এ জন্য যারাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাবেন প্রথমে তাদেরকে সমাজের বুকে ইসলামী সংস্কৃতির মজবুত ভিত গড়ে তুলতে হবে। এ ভিতের ওপরই দাঁড়িয়ে থাকবে ইসলামের বর্ণালী প্রাসাদ।

গ. মুসলমানরা একটি মিশনারী জাতি। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে যে সত্য আমানত স্বরূপ তাদের কাছে সংরক্ষিত আছে সে সত্য বিশ্বময় প্রচার করার কঠিন দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত। এ দায়িত পালন করা প্রতিটি মুসলিম নরনারীর ওপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের প্রচার প্রোপাগান্ডা মূলত: পুরোটাই সংস্কৃতি নির্ভর। বর্তমান সময়ে প্রচার মাধ্যম যার দখলে পৃথিবীর কর্তৃত্ব মূলত: তারই হাতে নিবদ্ধ। প্রচারের গুণে মিথ্যা সত্যের রূপ পরিগ্রহ করে আর সত্য পর্যবসিত হয় মিথ্যায়। সংস্কৃতির প্রতিটি মাধ্যম প্রচারের এক একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

এমতাবস্থায় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে বিশ্বে ইসলামের প্রভাব বিস্তারের আর কোন বিকল্প হাতিয়ার নেই। ব্যক্তিগত আচার আচরণ থেকে শুরু করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবিত উন্নয়নের সকল ফসলগুলো সংস্কৃতি নির্ভর হয়ে বিশ্বব্যাপী যে ব্যাপক মানসিক বিবর্তন ঘটাচ্ছে তার মোকাবেলা করা একমাত্র সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমেই সম্ভব। কোরআন হেকমত ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে দ্বীন প্রচারের যে আদেশ করেছে তার অনিবার্য দাবীই হচ্ছে যুগের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ারসমূহ ব্যবহার করে শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতিতে ইসলামের প্রচার করা। পুরনো দিনের প্রযুক্তি অকার্যকর বিবেচিত হলে সাথে সাথে নতুন দিনের নিত্য নব প্রযুক্তি গ্রহণ করে দ্বীন প্রচারের কার্যে ব্রতী না হওয়া একটি মারাত্মক অপরাধ। গোড়ামী বা কুপমন্ডুকতার কারণে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তার পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য।

তলোয়ারের মোকাবেলা করতে হয় তলোয়ার দিয়ে, জবানের মোকাবেলায় ব্যবহার করতে হয় সমৃদ্ধ জবান। অস্ত্র দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক হামলার মোকাবেলা করা যায় না,

www.icsbook.info

সাংস্কৃতিক হামলা প্রতিরোধ করা যায় না বিত্তবেসাত দিয়ে। প্রতিটি হামলার অস্ত্র যেমন ভিন্ন তেমনি ভিন্নতর অস্ত্র দিয়েই তার মোকাবেরা করতে হয়।

যেহেতু এখন উপর্যুপরি আঘাত হানা হচ্ছে সংস্কৃতির পথে, মুসলমানদের ঈমান ও আমল বিনষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে সর্বব্যাপী সাংস্কৃতিক হামলা, সে জন্য এর মোকাবেলায় শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। একদিকে মুসলমানদের ঈমান ও আমলের সংরক্ষণ এবং অন্যদিকে অমুসলমানদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা এই উভয়বিধ কাজের জন্যই এ মুহূর্তে সর্বাগ্রে সাংস্কৃতিক তৎপরতায় নিজেকে জড়িত করে নেয়া ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর জন্য অপরিহার্য।

গ. এ কথার মানে এ নয় যে, ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি নেতা ও কর্মীকে এখন গান গাওয়া শিখতে হবে, অভিনয় শিখতে হবে এবং এ ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিজকে জড়িয়ে ফেলতে হবে। বরং এ কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, যাদেরকে আল্লাহ স্বাভাবিকভাবে এসব যোগ্যতায় ভূষিত করেছেন অতি অবশ্যই তাদেরকে এসব কাজে নিয়োজিত হতে হবে। যারা গাইতে পারেন, লিখতে পারেন, অভিনয় করতে পারেন বা এ ধরনের অন্য কোন সাংস্কৃতিক কাজ করতে পারেন তারা অবশ্যই তা করবেন।

কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ এসব গুণের চাইতে অন্যবিধ যোগ্যতা বেশী দিয়েছেন তারা সে যোগ্যতারই বিকাশ সাধন করবেন। কিন্তু তাই বলে দাওয়াতী দায়িত্ব বিস্মৃত হওয়া কারো জন্যই সংগত বিবেচিত হতে পারে না। এই নিরিখে সাংস্কৃতিক তৎপরতার কাজগুলো এভাবে বিভাজন করা যেতে পারে। যাদের আল্লাহ সাংস্কৃতিক কর্মী হওয়ার মত যোগ্যতা দিয়েছেন তারা এ মনোভাব নিয়েই কাজ করবেন যে, আল্লাহ প্রদত্ত এ সাংস্কৃতিক প্রতিভার যথাযথ ব্যবহার না করলে যোগ্যতার অপব্যবহারের জন্য পরকালে তাকে জবাবদিহী করতে হবে।

ঘ. সাংস্কৃতিক কর্মী হওয়া মানেই উন্নততর মানুষ হিসাবে নিজকে পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নিজকে তিনি শ্রেষ্ঠ মুসলমান হিসাবে উপস্থাপিত করবেন। নিজকে শ্রেষ্ঠ মুসলমান হিসাবে পেশ করার মানে হচ্ছে, তিনি সাধারণ মানুষের চাইতে ইসলামকে বেশী জানবেন, কোরআন ও হাদিসের প্রত্যয় ও ব্যাপক জ্ঞানে তিনি হবেন অধিক পারদর্শী। তিনি ইসলামকে জানা ও মানার ক্ষেত্রে অন্য সকলের চাইতে অগ্রগামী হবেন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম মুসলমান হিসাবে নিজেকে পেশ করার জন্য নিরন্তর ও ক্রমাগত প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখবেন।

ইসলামী সংস্কৃতির যে সব হাতিয়ার তারা তৈরি করবেন তা তারা এ জন্যই তৈরি করবেন যে, এটাই হচ্ছে তাদের ওপর ইসলামের অপরিহার্য দাবী। তাদেরকে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, তারা যা উপহার দিচ্ছেন তা কেবল তাদের নিজের

www.icsbook.info

মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং তা ছড়িয়ে পড়বে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। ফলে, যদি কোন ভুল তারা করেন, তার প্রভাব পড়বে পুরো সমাজে। এতে যদি কোন পাপ হয় তবে তার দায়ভাগ তাদেরই বহন করতে হবে। এ জন্য তারা যা কিছুই উপহার দেবেন তা ইসলাম সম্মত হয়েছে কিনা তা গভীরভাবে বিবেচনা করে তবেই তা জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন। তাদেরকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তারা যা উপহার দিচ্ছেন তা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে কিনা। মূলত: তাদের মেধা, যোগ্যতা ও ভূমিকার ওপরই যেহেতু এসব জিনিসের সৌকর্য ও সৌন্দর্য নির্ভর করছে সে জন্য কোন কিছু সৃষ্টি করার সময় তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে চূড়ান্ত শ্রম ও সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার জন্য সর্বোতভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন: আমাদের করনীয়

আমরা যদি এ কথা স্বীকার করে নিই যে, বাতিলের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সত্যিকার অর্থেই আমাদের জন্য বিপুল ক্ষতি বয়ে আনছে, সংস্কৃতি চর্চা না করার কারণে আমাদের জাতিসত্ত্বা আজ প্রচন্ড হুমকীর সম্মুখীন, সমাজের বুকে ইসলামী পরিবেশ রচনায় ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা একটি অপরিহার্য মাধ্যম, ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত করতে হলে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ প্রয়োজন– তবে শক্তিশালী একটি ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে ঈমানের অপরিহার্য দাবী। এ দাবী পূরণ করতে হলে কেবল সংস্কৃতি চর্চা নয় বরং একটি সুপরিকল্পিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা করা অত্যাবশ্যক। এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি এ সম্পর্কে আমার একান্ত ব্যক্তিগত কিছু চিন্তা আপনাদের সুবিবেচনার জন্য পেশ করছি।

ক. সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

সংস্কৃতি চর্চা আর সাংস্কৃতিক আন্দোলন এক জিনিস নয়। আমাদের প্রয়োজন সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা। ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রতিটি মানুষ যেন নিজকে ইসলামের রঙে রাঙিয়ে তোলার জন্য স্বত:স্ফুর্তভাবে ক্রমাগত ও অব্যাহত গতিতে প্রাণিত হয় তার জন্য যে প্রচেষ্টা তারই নাম ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ইসলামী আন্দোলন যেমন জনগণকে ইসলামের দিকে প্রধাবিত করার মধ্যেই তার কাজকে সীমাবদ্ধ রাখেনা বরং বিপ্লব পূর্ণাঙ্গ করার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চায় – তেমনি ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনও কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক সাংস্কৃতিক তৎপরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা। প্রতিটি দেশজ প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রক্ষমতা যেমন কতিপয় প্রতিষ্ঠান ও ক্ষেত্রের আশ্রয়ে টিকে থাকে সংস্কৃতিও সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে কতিপয় প্রতিষ্ঠান, মাধ্যম ও ক্ষেত্রকে অবলম্বন করে। ইসলামী রাজনীতি চর্চার সময় কেউ যেমন বর্তমান

www.icsbook.info

সংসদের মোকাবেলায় আরেকটি সংসদ নির্মানের কথা চিন্তা করেনা বরং সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে এ সংসদ অধিকারের প্রচেষ্টা চালায় তেমনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোয় পরিচালিত জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও ক্ষেত্রগুলো দখল করার অব্যাহত প্রচেষ্ঠা চালানোর নামই ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বর্তমান বাংলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, রেডিও, টিভি বা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মোকাবেলায় আরেকটি বাংলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, রেডিও, টিভি বা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান তৈরীর আকাশ কুসুম কল্পনা করার নাম ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন হতে পারেনা। বরং ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের টার্গেট হওয়া উচিত সংস্কৃতি চর্চার এ ভিত্তিভূমিগুলো দখল করা।

সুপরিকল্পিত কর্মসূচী নিলে সংস্কৃতির এ ভিত্তিভূমিগুলোয় প্রভাব বলয় বৃদ্ধি করা মোটেই অসম্ভব নয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে প্রভাব বলয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা কি কি ফায়দা পেতে পারি এবার তা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

১. এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বাজেটের বিপুল পরিমান টাকা তাদের মধ্যেই বন্টিত হয় যাদের অধিকাংশই এখনো ইসলামের বিপক্ষে। ফলে দারিদ্রের যাতনা বিমুক্ত হয়ে তারা ইসলামের বিরোধিতায় ভূমিকা রাখতে পারে।

২. এখান থেকে যেসব বই বেরোয় এবং যেসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তার নেট লাভ যায় ইসলামের বিপক্ষে।

৩. এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করার মধ্য দিয়ে একজন ইসলাম বিরোধী ব্যক্তি কেবল আর্থিকভাবেই লাভবান হয়না বরং তার যোগ্যতার বিকাশ ঘটানোরও অপূর্ব সুযোগ লাভ করে। ক্রমাগত অনুশীলনের অবাধ সুযোগ পেয়ে তারা নিজেদের মানকে উত্তোরোত্তর উন্নত থেকে উন্নততর করে তোলে।

৪. এসব প্রতিষ্ঠানের কাঁধে সওয়ার হয়ে এমন সব ব্যক্তিরা জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতিমান ও বুদ্ধিজীবী হিসাবে আবির্ভুত হন যাদের চাইতে অনেক বেশী প্রতিভাবানরাও জাতীয় পর্যায়ে ন্যুনতম পরিচিতিটুকু পর্যন্ত লাভ করতে পারে না সুযোগের অভাবে।

এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে প্রভাব বলয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা– ১) বাতিলের এসব সুযোগ লাভ থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে পারি। ২) ইসলামের স্বপক্ষে এসব সুযোগ ব্যবহার করতে পারি।

অর্থনৈতিক সাশ্রয়, জনশক্তিকে স্বাবলম্বীকরণ, যে অর্থ ইসলামের বিপক্ষে ব্যয় হতো সে অর্থ ইসলামের স্বপক্ষে ব্যয় করা, জনশক্তির পেশাগত উৎকর্ষতা সাধন, অপসংস্কৃতি রোধ এবং ইসলামী সংস্কৃতিকে জাতীয়ভাবে বিকশিত করার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহে আমাদের প্রভাব বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। এতে

www.icsbook.info

বিশভাগের এক ভাগ সফলতা মানে সরকারী খাত থেকে বছরে ইসলামের বিপক্ষে ব্যবহৃত হতে পারতো এমন বিপুল ব্যয়ের সুযোগ ছিনিয়ে নেয়া এবং তা ইসলামের স্বপক্ষে ব্যবহার করানো। এতে দুটো লাভ হয়। এক. যে অর্থ ইসলামের বিপক্ষে ব্যয় হতো তা রোধ হয়, দুই. এ টাকা ইসলামের পক্ষে ব্যয় করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অথচ এ কাজটি করার জন্য প্রয়োজন মাত্র একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা, একজন সফল সংগঠক এবং একটি মহাসমাবেশকে সফল করার জন্য ব্যয়িত অর্থের সমপরিমান অর্থ।

খ. সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

আমরা বাংলা একাডেমী করার পরিকল্পনা নেবোনা এ কথার মানে এ নয় যে আমরা কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবনা। আমরা অবশ্যই বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তুলব, আমরা গড়ে তুলব ছায়ানট, উদীচী, থিয়েটারের মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যে সব প্রতিষ্ঠান আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাবে আর জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ অধিকার করার মত যোগ্য কলাকুশলী ও জনশক্তি তৈরী করবে।

গ. সাংস্কৃতিক বিভাগ ও সম্পাদক নিয়োগ।

ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করা প্রয়োজন একথা আমরা অনেকেই উপলব্ধি করি- কিন্তু কার্যত: এর চর্চার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার অবকাশ আমাদের হয়ে ওঠে না। কিন্তু এ কথাতো সত্য কর্মের ময়দানে নিরব অনুভূতির কোন দাম নেই- অনুভূতির বাস্তব বহি:প্রকাশই সেখানে মুখ্য বিষয়। তাই, আমরা যদি সত্যিই একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে চাই তবে ইসলামী দলগুলোর কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে উপশাখা পর্যন্ত সকল স্তরে সাংস্কৃতিক বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক নিয়োগ করতে হবে। অন্যান্য দায়িত্বের সাথে বাড়তি দায়িত্ব নয় বরং সাংস্কৃতিক বিভাগ দেখাশোনাই হবে সাংস্কৃতিক সম্পাদকের মূল দায়িত্ব। তিনি বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে নিয়মিত তার দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন এবং রিপোর্ট পেশ করবেন।

ঘ. পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে প্রতিপক্ষের জবাব দান। রাসূল (সা.) বলেন, 'এতো অনস্বীকার্য, আল্লাহর রাসূলকে হেফাযত করার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে তোমরা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে কাজ করছো। কলমের ভাষা দিয়ে তাকে আজ হেফাযত করার সময় এসে গেছে। কে আছো তীক্ষ্ণ মসীর আচড় নিয়ে এগিয়ে আসবে?' অন্য হাদীসে এসেছে, 'একবার হাসসান বিন সাবিতকে লক্ষ্য করে প্রিয়নবী (সা.) বললেন, তুমি আবু বকরের কাছে যাও। মুশরিকদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, তাদের বিবাদ বিসম্বাদের কালো অধ্যায় তিনি

www.icsbook.info

তোমাকে আনুপর্বিক বলতে পারবেন। গুণে গুণে বংশের নানাদিক তোমাকে দেখাতে পারবেন। আর তুমিও সে আলোকে নিন্দা-কাব্য রচনা করতে পারবে। যাও, তোমার সাথে জিব্রীল রয়েছেন।'

এধরনের আরো অনেক হাদীসে তিনি প্রতিপক্ষের জবাব দানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং প্রতিপক্ষের দুর্বলতা খুঁজে বের করার তাগিদ দিয়েছেন। তাই আজ প্রতিপক্ষকে জানা এবং তার জবাব দানের জন্য এমন একটি পাঠাগার প্রয়োজন যেখানে ইসলামের পক্ষ ও বিপক্ষের সকল সাহিত্য ও সৃষ্টির সমাবেশ আছে। আমরা যদি সত্যিই একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে চাই তবে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী আমাদেরকে অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের হাতিয়ার যেমন ইসলামী সংস্কৃতি তেমনি ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার হাতিয়ার এ পাঠাগার। সাংস্কৃতিক কর্মীদের হাতে এ অস্ত্র না দিয়ে তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠালে কখনোই ইপ্সিত ফল আমরা লাভ করতে পারবোনা।

ঙ. জাতীয়ভিত্তিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলা

একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে চাইলে জাতীয়ভিত্তিক একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। কারণ সাহিত্য ও শিল্প জাতীয় সম্পদ হলেও ব্যক্তিই তার উদ্ভাবক। ব্যক্তির এ সৃষ্টিকে সমষ্টির সামগ্রীতে পরিণত করতে পারে এ সংগঠন। যেমন খুলনার শিল্পীরা একটি চমৎকার গান তৈরী করলো। একটি জাতীয়ভিত্তিক সংগঠন থাকলে সে গানটি খুব সহজেই কেন্দ্রে চলে আসবে এবং কেন্দ্র থেকে তা আবার ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। এভাবে সারাদেশ থেকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলো সংগ্রহ করা এবং আবার তা সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া না গেলে আমরা বৈচিত্রময় সৃষ্টিসম্ভারে কখনোই সমৃদ্ধ হতে পারবো না। আন্দোলনের স্বার্থে কখন কার কোন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন এ কেন্দ্রীয় সংগঠন সে দিকনির্দেশনা দেবে। এছাড়া সারা দেশের সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে চিন্তার সমন্বয়, কর্মসূচীর সমন্বয়, পারস্পারিক বিনিময়ের মাধ্যমে গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন অপরিহার্য।

চ. শিল্পীদের সহায়তা

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের সহায়তা দান করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ মহানবীর নিম্নোক্ত বাণীটি থেকেই তা স্পষ্ট। রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'কবিদের আর্থিক সহযোগিতা দান করা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সমতুল্য।' আর এ কথা সকলেরই জানা যে, আল্লাহর পরে সন্তানের ওপর যার হক সব চাইতে বেশী তারা হচ্ছেন পিতা-মাতা। বিষয়টির প্রতি এত অধিক গুরুত্ব প্রদানের কারণ, শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীগণ যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ

www.icsbook.info

হিসেবে বিবেচিত হয়। জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে এদেরই সঠিক দিক নির্দেশনার ওপর। এরা মানুষকে দেয় আশা ও আশ্বাস, প্রেরণা যোগায় যে কোন কঠিন মুহূর্তে। নিবেদিত প্রাণ এসব শিল্পীরা সাধারণভাবে নির্লোভ ও বিষয়বুদ্ধিতে দুর্বল। বিড়ম্বনার পর বিড়ম্বনার মোকাবেলা করতে হয় তাদের। সমাজের বঞ্চনা, গৃহের গঞ্জনা, মানুষের অবজ্ঞা, অবহেলা ও তিরস্কার সহ নানাবিধ জটিলতার মধ্য দিয়েও এরা সমাজের জন্য তাদের সৃষ্টিকে উপহার দিয়ে যায় কেবলমাত্র প্রাণের তাগিদে। আবার অনেকে সে সুযোগটুকুও পায় না। ফুল ফোটাতে গিয়ে অকালেই ঝরে যায়।

কবি সাহিত্যিক শিল্পীরা সমাজদেহের চক্ষু, সভ্যতার বাগান। সমাজ পরিচালকরা সে বাগানের মালি। তারা যত বেশী এ বাগানের পরিচর্যা করবে সমাজে তত বেশী হৃদয়ের পুষ্প ফুটবে। যে জনগোষ্ঠী এ বাগানের পরিচর্যায় অমনোযোগী হবে তারা বঞ্চিত হবে মানবতার পুষ্প সৌরভ থেকে।

ফুল যেমন নিজের সৌরভ ও সৌন্দর্য বিলিয়ে আনন্দ পায়, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবিরাও তেমনি আপনার সৃষ্টি জগতে দিয়ে আনন্দ পায়। কিন্তু এ দেয়াটা নির্ভর করে নেয়ার ওপর। যারা তাদের কাছে চাইবে এবং যেমনটি চাইবে তারা তেমনটিই উপহার দিবে। সে জন্য একটি কল্যাণময় ইসলামী সমাজ যাদের কাম্য তাদের উচিত, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা দান করা। এ পৃষ্ঠপোষকতা তারা যতবেশী দিতে পারবেন ততই ইসলামী সমাজের অনুকূলে তাদের সৃষ্টি বৈচিত্রের বিকাশ ঘটবে। এ জন্যই মহানবী (সা.) শিল্পী সাহিত্যিকদের সহায়তা করার বিষয়টিকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, এ পৃষ্ঠপোষকতা যেন কেবল ভাবাবেগ তাড়িত না হয়। পানি না দিয়ে অধিক সার দিলে যেমন বৃক্ষ মারা যায়, তেমনি বেশী পানিও বৃক্ষের জন্য ক্ষতিকর। তাই একদেশদর্শী পরিকল্পনা না নিয়ে আমাদের উচিত সুচিন্তিত ও সুষম পরিকল্পনা গ্রহণ। তবেই সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কাঙ্খিত ফল লাভ সম্ভব হবে।

ছ. সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মসজিদে নববীতে একটি আলাদা উঁচু মিম্বর বানিয়েছিলেন যে মিম্বর থেকে শুধুমাত্র কবিতা আবৃত্তি করা হতো। অন্য কোন কাজে এ মিম্বর ব্যবহার করা হতোনা। [তিরমিজী শরীফের হাদীস: 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) মসজিদে হাসসান (রা.)এর জন্য উঁচু মিম্বর তৈরী করিয়ে নেন। তার ওপর চড়ে হাসসান (রা.) নবীজীর গৌরব গাথা এবং মুশরিকদের নিন্দা কাব্য আবৃত্তি করতেন। মহানবী বলতেন, হাসসানের জিভ যতদিন রাসূলের পক্ষ হয়ে কবিতার বাণী শুনিয়ে যাবে, ততদিন তার সাথে জিব্রিল

www.icsbook.info

থাকবেন।'] এ মিম্বর বানানো থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে কাব্যচর্চা সে সময় কোন হঠাৎ আবেগের বিষয় ছিলনা বরং ইসলামী আন্দোলনের একটি স্থায়ী কর্মসূচী ছিল। সাহাবীগণ নিয়মিত সেখানে সমবেত হতেন এবং রাসূল (সা.)সহ সকলে সম্মিলিতভাবে কবিতার আবৃত্তি শুনতেন। আর মসজিদে নববীতে অবস্থান করতেন সত্তরজন জ্ঞান সাধক– ইতিহাসে যারা আসহাবে সুফফা নামে পরিচিত। এ থেকেই কাব্য ও শিল্পকলার প্রতি ইসলামী আন্দোলনের বিকাশমান সময়ে মহানবী কতটা গুরুত্ব প্রদান করতেন তা অনুধাবন করা যায়। সাংস্কৃতিক তৎপরতার গুরুত্ব নির্ধারনেরে সময় এ বিষয়গুলো আমাদের স্মরণ রাখা দরকার।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, পৃথিবীর প্রতিটি মানস পরিবর্তন মূখ্যত: ঘটিয়েছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিন্তু তার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সংস্কৃতি কর্মীরা। সাংস্কৃতিক কর্মীরা হচ্ছে যুগের মুয়াজ্জিন আর রাজনৈতিক নেতারা ইমাম। আধুনিক বিশ্বে যুগের নকীবদের মুসলমানরা যতক্ষণ পর্যন্ত ময়দানে না পাঠাতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত লাব্বাইক লাব্বাইক বলে ঘর থেকে ছুটে আসবে না মুসল্লিরা। জনগণ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে না কোন ইমামের পিছনে- ইসলামী বিপ্লব সাধন সেখানে সম্ভব হবে না। এ জন্যই সাংস্কৃতিক কর্মীদের ব্যাপকভাবে ময়দানে নামানো আজ অত্যাবশ্যক। অত্যাবশ্যক সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

জ. সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব পরিহার

প্রায়শ:ই এবং অনেকেই সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতি এমন একটি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করেন যা অনভিপ্রেত। ভাবখান' এমন যেন এটা একটা পাগল-ছাগলের আড্ডাখানা। এ ধরনের ধারনা বরং সাংস্কৃতিক কর্মীদেরকে দূর্বলতা জিইয়ে রাখার উৎসাহ যোগায়। সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতি এহেন আচরনের কোন হেতু নেই, কারণ শ্রমিক, ছাত্র, চাষী, মহিলা অংগনের মতই এ অংগনের কর্মীরাও মূলত: ইসলামী আন্দোলনেরই কর্মী। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের যে মেজাজ ও মান সাংস্কৃতিক অংগনের কর্মীদেরকে অবশ্যই সে মান বজায় রাখতে হবে এবং সে ভাবেই তাদের গড়ে তুলতে হবে। বস্তুত মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ কবি সাহিত্যিকদের যে গুরুত্ব ও মর্যাদা দিতেন অন্তত: সেটুকু গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে সবাইকে।

ঝ. যথাযথ কর্ম বিভাজন ও বিভাগীয় কাজের প্রতি গুরুত্ব প্রদান

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামী আন্দোলনের বিকাশমান কঠিন মুহূর্তে মসজিদে নববীতে প্রায় সত্তরজন সাহাবীকে ইসলামী জ্ঞানের সার্বক্ষণিক চর্চার জন্য নিয়োজিত রেখেছিলেন। জ্ঞান চর্চা ছাড়া যাদের আর কোন কাজ ছিলনা। অল্প সংখ্যক সাহাবী বাতিলের বিপুল শক্তির মোকাবেলায় আল্লাহর ওপর ভরসা করে

www.icsbook.info

চলে যেতেন যুদ্ধের ময়দানে। অথচ আসহাবে সুফফার এসব সাহাবীগণ মসজিদে নববীর চত্তরে জ্ঞানের চর্চায় থাকতেন মশগুল। জেহাদে অংশ গ্রহণের জন্য বলা হতোনা তাদেরকে। আরেকটি ঘটনা। মুজাহিদগণ জেহাদ থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন। গনিমতের মাল বন্টনের তালিকা পেশ করা হলো নবীর কাছে। একজন সাহাবী কবি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি বলে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি সে তালিকায়। মহানবী তার নাম তালিকায় নেই কেন জানতে চাইলে সাহাবীগণ বললেন তিনিতো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি। রাসূল (সা.) বললেন, তিনি তোমাদের মত তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করেননি বটে তবে কলম দিয়ে করেছেন। তোমরা কি তার কবিতা পড়ে অনুপ্রাণিত হওনি? তিনি সে কবির নাম তালিকাভুক্তির নির্দেশ দেন এবং মুজাহিদদের সমান গনিমতের মাল তিনিও লাভ করেন। ইসলামী আন্দোলনের এ কর্ম বিভাজনকে আমাদের বুঝতে হবে। যাকে যে ক্ষেত্রে নিয়োজিত করা হয়েছে তার হক সে আদায় করেছে কি না সেটাই মুখ্য বিষয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, দাড়ি কামানোর জন্য তলোয়ার বানানো হয়না– খুর বানানো হয়না যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে।

উপসংহার

যারা সমাজপতি বা নেতৃত্বের আসনে থাকবেন ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার দায়ভাগ তাদের ওপরই বেশী বর্তায়। সমাজের প্রতিটি অঙ্গন যেন ইসলামের আলোকে গড়ে উঠে সে জন্য ভারসাম্যপূর্ণ কর্মসূচী দেয়ার দায়িত্ব তাদের। এক্ষেত্রে বর্তমান সময় যেহেতু সাংস্কৃতিক তৎপরতা জোরদার করার দাবী জানাচ্ছে সে জন্য এ অঙ্গনে কাজ বৃদ্ধি করার দায়িত্ব তাদেরকেই বহন করতে হবে। রাজনৈতিক তৎপরতা জোরদার করার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক তৎপরতা বৃদ্ধির গুরুভার বহনে তারা যত বেশী সক্ষম হবেন সমাজ তত দ্রুত ইসলামের দিকে এগিয়ে আসবে। শিল্পীরা শিল্প চর্চা করে কিন্তু তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে অন্যরা। পৃষ্ঠপোষকতা যত জোরদার হয় শিল্প চর্চা তত বৃদ্ধি পায়। এ জন্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পৃষ্ঠপোষকতা বাড়াতে হবে।

দ্বিতীয়ত: শিল্পীদের সংগঠিত করার দায়িত্বও তাদেরকেই গ্রহণ করতে হবে। বেছে বেছে ভাল সংগঠকদেরকে দায়িত্ব দিতে হবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সংগঠক হওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক কর্মী বা শিল্পী হওয়া জরুরী নয়- জরুরী হচ্ছে সংস্কৃতির সমঝদার হওয়া। একটি সুন্দর প্রাসাদ তৈরীর কৃতিত্ব যতটা উত্তম কারিগরের তার চাইতে অনেক অনেক বেশী কৃতিত্ব তার- যিনি সে প্রাসাদটি নির্মাণ করান। মূলত: তার চাহিদাকেই কার্যকর করে তোলেন সংশ্লিষ্ট কারিগর। এজন্য লোকে কোন্ কারিগর বাড়িটি বানিয়েছে তার প্রশংসা করার চাইতে যিনি

www.icsbook.info

প্রাসাদটি নির্মাণ করিয়েছেন তারই প্রশংসা করে বেশী। যে বাইশ লক্ষ শ্রমিক তাজমহল বানিয়েছে জগত তাদের চেনে না- তারা চেনে সম্রাট শাহজাহানকে- যিনি তাজমহলকে নির্মাণ করিয়েছেন। সমাজপতিরা বা নেতারা যখন সম্রাট শাহজাহানের ভূমিকা পালন করবেন কেবল তখনই সাংস্কৃতিক কর্মীরা বাইশ লক্ষ শ্রমিক হয়ে সংস্কৃতির তাজমহল গড়ে তুলতে পারবেন। অন্যথায় শ্রমিকরা ছড়িয়ে থাকবে সমাজের বুকে কিন্তু কোন তাজমহল নির্মিত হবে না। বস্তুত ইসলামী নেতৃত্বের ওপরই এ অপরিহার্য দায়িত্ব অর্পিত যে, তারা সঠিক সিদ্ধান্ত ও কার্যকরী পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সংস্কৃতির পরিমন্ডলকে ইসলামের আলোকে গড়ে তুলবেন।

তৃতীয়ত: ইসলামী আন্দোলনের যারা সাধারণ কর্মী ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে তাদের ভূমিকা এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের সচেতন ও যথাযথ ভূমিকা ছাড়া ইসলামী সংস্কৃতি কিছুতেই বিস্তার লাভ করতে পারে না। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা যা সৃষ্টি করেন সে সৃষ্টিকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব তাদেরই। কবি ও শিল্পীরা সর্বক্ষণ বিভোর থাকবেন নিত্য নতুন সৃজন কাজে। এ সব সৃষ্টি যখন বিস্তার লাভ করবে তখন সে শিল্পী উৎসাহে দীপ্ত হবেন এবং আরো চমৎকার কিছু সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করবেন। শিল্পীদের কাছে এ উৎসাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

কিন্তু যদি বিষয়টি এমন হয় যে, একজন লেখক একটি উত্তম লেখা তৈরী করলেন বা একজন শিল্পী একটি সুন্দর গান বানালেন কিন্তু তা কোথাও পরিবেশন করতে পারলেন না- তবে সে লেখক বা শিল্পী আরেকটি নতুন লেখা বা গান রচনার উৎসাহ পাবেন না। আবার যদি বিষয়টি এমন হয় যে, কোন একজন দরদী ব্যক্তি সে লেখাটি বই আকারে প্রকাশ করলেন বা গানটির ক্যাসেট বের করলেন কিন্তু তা বিক্রি হলো না- সে অবস্থায় ঐ ব্যক্তি এরপর এ ধরনের আর কোন উদ্যোগ নিতে সাহসী হবেন না। ফলে, শিল্পচর্চা স্তব্ধ হয়ে যাবে।

বর্তমানে আমাদের এখানে এমন অবস্থাই বিরাজ করছে। ফলে, শিল্পী সৃষ্টি হচ্ছে কম এবং উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মানগত উন্নয়ন হচ্ছেনা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য চাই ব্যাপক উদ্যোগ ও উদ্যম। সর্বস্তরের কর্মীরা যদি এ ব্যাপারে সচেতন উদ্যোগ গ্রহণ করেন তবেই কেবল এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। প্রাথমিকভাবে সৃজনশীল বই এবং ক্যাসেট সমূহ ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে সকল কর্মী সাংস্কৃতিক কাজের বিস্তৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। ফুলের কাজ সৌন্দর্য ও সুবাস ছড়ানো। মানুষ যখন তা গ্রহণ করার জন্য আন্তরিক হয় তখনই কেবল সে সেই সুবাস ও সৌন্দর্য বিলাতে পারে, অন্যথায় নয়। সংস্কৃতির সৌন্দর্য ও সুবাস নেয়ার জন্যও তেমনি সবাইকে আন্তরিক হতে হবে।

www.icsbook.info

"আমরা শাসনের এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছি। রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বের অবসান ঘটেছে। কর্তৃত্ব এখন সংস্কৃতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার হাতে।" "আমাদের দূর্বলতার সুযোগে পশ্চিমারা যখন সংগঠিত ভাবে এগুচ্ছে আমরা তখনও আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কোন পরিবর্তন না এনে আগের মতই কাজ করছি। এ ধরনের অবহেলা আমাদের সমস্যাকে কেবল প্রকটই করে তুলবে।

এ জন্য মুসলমানদের মধ্যে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের আগ্রহ ও দক্ষতা বাড়াতে হবে এবং এসব প্রযুক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন তা ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রতিটি সচেতন মুসলমান যদি নিয়মিত সাংস্কৃতিক তৎপরতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহী ভূমিকা পালন করেন, নেতৃবৃন্দ সঠিক পরিকল্পনা এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন, শিল্পী সাহিত্যিকরা নিরলসভাবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন তবে এদেশে আগামী দিনের ইসলামী বিপ্লবই কেবল ত্বরান্বিত হবে না বরং যে জনগোষ্ঠী ক্রমাগত জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছে তারা তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে জান্নাতের দিকে- নাজাতের দিকে দ্রুত ছুটে আসবে। মানুষকে এ নাজাতের দিকে ধাবিত করার জন্য দরকার সময়োপযোগী পরিকল্পনা ও প্রতিটি দায়ী'র নিরলস এবং বিরামহীন প্রচেষ্টা। আল্লাহ সবাইকে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করার তৌফিক দিন।

www.icsbook.info

লেখক পরিচিতি

আসাদ বিন হাফিজ। জন্ম: ১লা জানুয়ারী ১৯৫৮। শিক্ষা: বি.এ. (অনার্স), এম. এ (বাংলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংগঠন : সদস্য, বাংলা একাডেমী; বাংলা সাহিত্য পরিষদ; আলমানার অডিও ভিজুয়াল সেন্টার; ঢাকা সাহিত্য সমাজ; কবি গোলাম মোস্তফা ট্রাস্ট। সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। পরিচালক, আল কোরআন একাডেমী ঢাকা; প্রীতি সাহিত্য ফোরাম। সহ-সভাপতি, ফুলকুড়ি লেখক ফোরাম। সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক, কেন্দ্রীয় ফুলকুঁড়ি আসর (৭৮-৮২); সভাপতি, সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠী (৭৮-৮০); সেক্রেটারী, বিপরীত উচ্চারণ (৭৮-৮৪); প্রচার সম্পাদক, স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ (৮০-৮২)

প্রকাশিত গ্রন্থ : গবেষণা: আল কোরআনের বিষয় অভিধান, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। **কবিতা:** কি দেখো দাঁড়িয়ে একা সুহাসিনী ভোর, অনিবার্য বিপ্লবের ইশতেহার। **গল্প:** পনরই আগষ্টের গল্প। **জীবনী :** আপোষহীন এক সংগ্রামী নেতা, নাম তার ফররুখ। **শিশু-কিশোর:** হরফ নিয়ে ছড়া, আলোর হাসি ফুলের গান, নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন, কুক কুরু কু, বাংলা পড়া চতুর্থ ভাগ, বাংলা পড়া পঞ্চম ভাগ, ইয়াগো মিয়াগো, আলোর পথে এসো। **রহস্য সিরিজ :** গাজী সালাহউদ্দীনের দু:সাহসিক অভিযান, সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান, সুবাক দুর্গে আক্রমণ, ভয়ংকর ষড়যন্ত্র, ভয়াল রজনী, আবারো সংঘাত, দুর্গ পতন, ফেরাউনের গুপ্তধন। **সম্পাদনা:** রাসূলের শানে কবিতা, নির্বাচিত ইসলামী গান, নির্বাচিত ইসলামী গান-১ থেকে ৪ খণ্ড, নির্বাচিত হামদ, নির্বাচিত নাতে রাসূল (সা.), রাজপথের ছড়া। বিদেশী **সাহিত্যের অনুবাদ সম্পাদনা :** নসীম হিজাযীর উপন্যাস সীমান্ত ঈগল, হেজাযের কাফেলা, আঁধার রাতের মুসাফির, কায়সার ও কিসরা, ইরান তুরান কাবার পথে, শেষ বিকালের কান্না, কিং সায়মনের রাজত্ব, ইউসুফ বিন তাশফিন। ভগওয়ান এস গিদওয়ানির উপন্যাস দি সোর্ড অব টিপু সুলতান।

সম্পাদনা সহযেগী : কাব্য সমগ্র / গোলাম মোস্তফা, কবিতা সমগ্র / তালিম হোসেন।

সম্মাননা : কলম সেনা প্রবর্তিত সাহিত্য পুরস্কার '৯৪, কোয়ান্টাম ফাউণ্ডেশন প্রবর্তিত এম. ইউ. আহমদ পদক '৯৬, বাংলাদেশ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ প্রবর্তিত সাহিত্য পুরস্কার '৯৭।